মানুষ নামক জন্তু

মনোজ বসু

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ, ১৩৬৬

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—শ্রীভোলানাথ হাজরা
রূপবাণী প্রেস
৩১ বাদুড়বাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ—চিত্র
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ—মুদ্রণ
মোহন প্রেস

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

তিন টাকা

পরম প্রিয়

সৈয়দ মুজতবা আলী

করকমলেষু

৯ শ্রাবণ, ১৩৬৬

এই লেখকের

উপন্যাস

মানুষ নামক জন্তু
রক্তের বদলে রক্ত
আগস্ট, ১৯৪২
এক বিহঙ্গী
ওগো বধূ সুন্দরী
জলজঙ্গল
নবীন যাত্রা
বকুল
বাঁশের কেল্লা
বৃষ্টি, বৃষ্টি !
ভুলি নাই
শত্রুপক্ষের মেয়ে
সবুজ চিঠি
সৈনিক
আমার ফাঁসি হল

ভ্রমণ

চীন দেখে এলাম ১ম
ঐ ২য়
সোভিয়েতের দেশে দেশে
পথ চলি
নতুন ইয়োরোপ : নতুন মানুষ

গল্প

গল্প-সংগ্রহ (১ম খণ্ড)
একদা নিশীথকালে
কাচের আকাশ
কিংশুক
কুঙ্কুম
খদ্যোত
দেবী কিশোরী
নরবাঁধ
পৃথিবী কাদের ?
মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প

নাটক

নূতন প্রভাত
প্লাবন
বিপর্যয়
বিলাসকুঞ্জ বোর্ডিং
রাখিবন্ধন
শেষ লগ্ন
ডাকবাংলো (দেবনারায়ণ গুপ্ত নাটকায়িত)

দুই বোন, দুর্গা আর তারা। মাঝে এক ছেলে, দু-বছরেরটি হয়েছিল। কপালে সইল না, ফাঁকি দিয়ে চলে গেল। সে যাক, অনেক দিন হয়ে গেছে। দুর্গা বড় হয়েছে। গাঁয়েরও এখন বিস্তর উন্নতি—হাই-ইস্কুলে মেয়েরা পড়ছে ইদানীং ছেলের সঙ্গে। ভাল মেয়ে দুর্গা—অঙ্কের মাস্টার যদু হালদার শতমুখে ব্যাখ্যান করেন। ফাইন্যাল পরীক্ষা দিল সে এবার। আর এক ব্যাপার—পরীক্ষার মাস দেড়েক আগে মাঘ মাসের দশুই তারিখে দুর্গার বিয়ে হয়ে গেল। সুবিধা মতো ভাল ছেলে পেয়ে গোপেশ্বর ডাক্তার দেরি করলেন না। ওদের হল শখের পড়া—গান-বাজনা সেলাই-ফোঁড়াই এ সবের মতো পড়াও হল কুমারী মেয়ের বাহার একটা। পাশ করে দশটা-পাঁচটা অফিস বেরুবে না, কিছুই না—বীরেস্থে ভুলে যাবে সমস্ত। পাশ না হয় তো ফেলই হবে—তাই বলে নিরঞ্জনের মতো পাত্র ছাড়া যায় না। দিন-কাল যা হয়ে আসছে, দায়মুক্ত হলে নিশ্চিন্ত।

অতএব বিয়ে হয়ে গেল দুর্গার। এবং শ্বশুরবাড়ি থেকে এক পাক ঘুরে এসে একজামিনেও বসল। বিয়ের আগে ও পরে লেখাপড়া কতটা কি হয়েছে, ফল বেরুলে বোঝা যাবে। আপাতত উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। চালচলন দেখে তাই বলবে বটে লোকে! স্নান করে এসে সবুজ রঙের শাড়ি পরেছে একখানা—পায়ে তো হাঁটে না আজকাল—ঐ যা বলা হল, উড়ে বেড়ায়—সবুজ টিয়াপাখি যেন বাড়িময় ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ করে উড়ে বেড়াচ্ছে। রাঁধাবাড়া করবে না, নির্মলা উনুনের ধারে মেয়েকে যেতেই দেবেন না। তবু দেখ, সকলের আগে ঝুপঝুপ করে ডুব সেরে এলো খিড়কি-পুকুরে। স্নানের পর পুবের দালানে এসে ঢুকল। গুণগুণ করে সুর ভাঁজছে আর চিরুনি

দিয়ে পাতা কাটছে মাথার চুলে। টিপ পরছে। বর তো সেই কতদূরের কলকাতায়, সাজগোজ করে কাকে দেখাবি ওলো দুর্গা?

আর তারা—ছোট মেয়ে তারা? ছোট কে বলবে—দুর্গা তো রোগা-ঝোগা, গায়ে-গতরে তারাই যেন বড়দিদি। চোখ দিতে নেই, কেউ চোখ দিও না। কিন্তু দুর্গার বদলে তারার বিয়েটা আগে দিলে অন্যায় হত না। তা একটা মিনিট যদি বাড়ির মধ্যে দাঁড়াবে পোড়ারমুখি মেয়ে! পাড়ায় টহল দিচ্ছে। এখন, আজ সকাল থেকে অধিষ্ঠান হয়েছে জবেদ মিঞার বাড়ি। বাড়িটা একেবারে কাছে। ক্ষেত আর একটা বাঁশবন—তারই এপার-ওপার। কাছাকাছি হওয়াতে আরও কাল হয়েছে। বড়গিন্নি অর্থাৎ বুড়ি ঠাকুরমা খিচখিচ করেন: হিঁদুঘরের ধুমসি মেয়ের ওদের বাড়ি আস্তানা। কী অনাছিষ্টি রে বাপু! জাতজন্ম কিছু আর থাকতে দেবে না।

নাতি মরে গিয়ে তারপরে মায়ের কোল-মোছা মেয়ে। তারা ঠাকুরমার বড্ড পেয়ারের। তাই নিয়ে দুর্গা কথা শোনাতে ছাড়ে না। [illegible] রাত্রেও একচোট হয়ে গেল। দুর্গা বলে, একচোখো ঠাকু-মা। আমরা কাছে গেলে তো কাপড় ছেড়েছি কিনা শতেকবার জেরা কর। তারার বেলা কি? সে বুঝি ভটচাজ্জি? তার সময়ে দোষ হয় না?

তারা তখন বড়গিন্নির কোলের মধ্যে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে। ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমির গল্প হচ্ছে। গল্প থামিয়ে বড়গিন্নি ফোকলা দাঁতে হাসেন: দেখ না, তারার গায়ে হাত দিয়ে দেখ, তা হলে টের পাবি। আগাপাস্তলা তুলসির জল ছিটিয়ে তবে নিয়েছি। তুই যে মানিস নে, জল ছিটতে গেলে তিড়িং ছুটে করে পালাস। তা কাপড় ছাড়া থাকে তো বোস এসে দিদি। তারার পাশে এইখানটা বসে পড়।

দুর্গা ঘাড় নাড়ে: না ঠাকু-মা, বসে বসে আজেবাজে গল্প শুনতে পারি নে আমি। ভাল লাগে না।

বসে বসে আজেবাজে চিঠি লিখতে পারিস তো পাতার পর পাতা।

দুর্গা ভ্রূভঙ্গি করে বলে, বয়ে গেছে। 'আপনি কেমন আছেন, আমি ভাল আছি'—এই। বাড়তি একটা কথাও নয়। তা-ও মায়ের জন্যে। দিনের মধ্যে এক-শ বার তাগাদা : লিখেছিস চিঠি? লেখ এইবার, গুছিয়ে-গাছিয়ে ভাল করে লিখবি। মা হয়ে এই সমস্ত আমায় বলে—লজ্জাও করে না!

মায়ের তাগাদা মনে পড়েই দুর্গা বুঝি তাড়াতাড়ি গিয়ে সেই কাজে বসল। ক্ষণ পরে বড়গিন্নি গল্প ছেড়ে তারাকে বিধিনিয়ম শেখাচ্ছেন : বয়স কম হলেও বাড়ন্ত মেয়ে যখন, যেখানে সেখানে হুট করে যেতে নেই। দুর্গার বিয়ে হয়ে গেছে, তার যাওয়ায় তত দোষ হয় না। কিন্তু বিয়ে হয়নি এমন সব মেয়ে কক্ষণো জোরে হাসবে না, নরমশরম হয়ে চলাফেরা করবে, পারতপক্ষে ঘরের বার হবে না…

রাত্রিবেলা মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে এত সমস্ত উপদেশ দিলেন। কিন্তু ফলটা কি হল? অরণ্যে রোদন। সকালে উঠেই ঝুমঝুম আওয়াজ তুলে তারা বেরিয়ে পড়ল। গিয়ে জুটেছে জাবেদ মিঞার বাড়ি। আজকে এক বিশেষ ব্যাপার সেখানে, [illegible] লোহার শিকলি দিলেও শিকলি কেটে পালাত। বুধি-গাইয়ের বাছুর হবে। বাড়ির বাইরে গোয়ালের পাশে কাঁঠালতলায় বুধিকে বেঁধে রেখেছে, সেইখানে তারা। তারা বুধির সঙ্গে কথা বলছে, কত রকমে সাহস দিচ্ছে তাকে। গলা চুলকে দেয়, আরাম পেয়ে গরু তখন চোখ বোঁজে। জবাব না দিলে কি হবে, গরু বোঝে কিন্তু সব।

ছেলেমানুষ তারার মুখে পাকা পাকা কথা। বলে, পাপ করেছিল কিনা, তার শাস্তি। সেইজন্য গরু কথা বলতে পারে না। হাল চষে, গাড়ি টানে, সকলের বেগার খেটে বেড়ায়। আর মেয়েমানুষ হল তো বাঁটের দুধটুকুও পেটের বাছুরকে খাওয়ানোর জো নেই; মানুষে কেড়ে-কুড়ে খায়।

নুর অর্থাৎ আমিনুর জাবেদ মিঞার আগের বউয়ের ছেলে।

তারার চেয়ে বয়সে ছোট। পুঁটিমাছ ধরছিল রাস্তার ওপারে। ছিপ-সুতো গুটিয়ে একবারে উঠে এলো। ডান হাতে ছিপ, বাঁ হাতে খালুই।

বুধি ছোঁক-ছোঁক করে খালুয়ের কাছে এসে। নুর বলে, দেখ রে তারা, বোলা কি রকম বুধির। হি-হি-হি, ভাবছে কোন খাবার জিনিস নিয়ে যাচ্ছি।

চোখ-মুখ ঘুরিয়ে তারা বলে, ঐ লোভই হল কাল। তুই জানবি কি করে, পুঁথিপুরাণে সব আছে। শোন বলি। দুর্গোচ্ছোবের সময় মাঝখানের ঐ দশহাতওয়ালা ঠাকরুন —মা-দুগ্গা যিনি গো—নৈবিদ্যি সাজিয়ে দিয়েছে মায়ের সামনে। গরু মণ্ডপে উঠে নৈবিদ্যির চাল কড়মড়র করে চিবোয়। ভোগের আগে প্রসাদ। দুগ্গা তো রেগে টং। আমার অংশ হয়ে এমনধারা লোভ! যে-মুখে খেয়েছিস, সেই মুখ বন্ধ। শাপ দিয়ে ঠাকরুন অন্তর্ধান করবেন, গরু তাঁর পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মুখ বন্ধ হলে খাওয়াও বন্ধ। অন্নে তো মরে যাবে একেবারে। খুব কান্নাকাটি। ভগবতী শেষটা নরম হয়ে বললেন, আচ্ছা, মুখ বন্ধ হল না, কথা বন্ধ। গরু সেই থেকে বোবা।

দুটো পুঁটিমাছ হাতের চেটোয় নিয়ে নুর বলে, খাবি নাকি রে বুধি? খা—

তারা বলে, কী বোকা তুই নুর! উনা হলেন ঠাকুর-দেবতার অংশ—মাছ খাবেন কি রে? নিরামিষ ছাড়া খান না।

বোকা বলায় আমিনুর চটে গেছে: ঠাকুর-দেবতারা তো আস্ত আস্ত পাঁঠাবলি খাচ্ছেন হরদম। কালী এক মেয়েমানুষ ঠাকুর—তিনি তো মোষ অবধি ছাড়েন না। আসল ঠাকুর ঐ, আর অংশ হয়ে শাস্তশিষ্টি কেন রে?

তারা হেসে বলে, দেখ তবে চেষ্টা করে।

মাছ শুঁকে শুঁকে বুধি মুখ ঘুরিয়ে নিল। দুটো-একটা আধ-শুকনো ঘাস—তাই খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে।

কি রে ?

স্থুর বলে, জানি জানি। পুঁটিমাছ কিনা—সেইজন্যে খেল না। রুই-কাতলা হলে দেখতিস।

তারার মা নির্মলা ডাকছেন ওদিকে বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে, তারা-আ-আ—

সাড়া দেবে কি, স্থুরের কথা শুনে সে হেসে খুন। রাস্তায় গোপেশ্বর। হোমিওপ্যাথি ডাক্তার বটে, কিন্তু ভারি পশার। বাড়ি ফিরছেন এখন। বাবাকে দেখে তারা ডাকে : ও বাবা, স্থুর কি বলে শোন। রুই-কাতলা হলে গরু নাকি খেয়ে নিত।

গোপেশ্বর বললেন, গরু আজ ছেড়ে দেয় নি—ও, পালান ছেড়েছে, তাই।

পালান কি বাবা ?

দেখছিস না, বাঁট মোটা কি রকম। ঝুলে পড়েছে ওখানটা। বাছুর হবার দেরি নেই।

অধীর হয়ে তারা বলে, কখন বাবা, কত দেরি ?

আবার নির্মলার গলা : কোন দিকে গেলি রে মুখপুড়ি ? খাবি-দাবি নে ?

গোপেশ্বর বলেন, বাছুর হলে দেখবি এসে। বেলা হয়েছে, বাড়ি চল।

আমিস্থুরকে জিজ্ঞাসা করেন, তোর বাপ কোথায় রে ? আছে তো বাড়ি ?

স্থুর বলে, উঠোনে লাউয়ের মাচা বাঁধছে। আজ আর গামালে বেরোয় নি। এসে এসে দেখে যাচ্ছে। আমিও দেখছি।

চল রে তারা—

বাপ গ্রেপ্তার করে নিয়ে চললেন। তার মধ্যে মুখ ফিরিয়ে তারা

বলে যায়, বাছুর হলে ডাকবি কিন্তু মুর। হলেই অমনি ডাকবি। না ডাকলে দেখিস কি করি।

চান করবে, খেতে বসবে, তার ফাঁকেও তারা ছুটে এসে দেখে যায় বাছুর হল কিনা। আর এই ঝঞ্ঝাট হয়েছে পায়ের মল। এক পা নড়তে গেলেই আওয়াজ। মল পরা উঠে গেছে। কিন্তু বড়গিন্নি সাধ করে পরিয়ে দিয়েছেন, মল পরে ছোট নাতনী বাড়িময় ঝুমঝুম করে বেড়াবে। দুর্গারও ছিল, বড় হয়ে এখন ছেড়ে দিয়েছে। কবে যে বড় হবে তারা, কত দিন আর পরে বেড়াতে হবে! না পরলে দুঃখ হয় ঠাকুরমার মনে। তিনি রাগ করেন। কিন্তু আজকে মলজোড়া খুলে রেখে সে জবেদের বাড়ি ছোটে। মলের বাজনায় জানাজানি হবে।

যতবার আসে, বুধি ঘাস খাওয়া বন্ধ করে মুখ তুলে তাকায়। কি যেন বলতে চায়—কষ্ট হচ্ছে তো বড্ড। বাচ্চা হবার সময় মেয়েদের কী কাতরানি! মুরের মা মারা যাবার পরে জবেদ আর এক বউ ঘরে এসেছে। আয়েসা। ও-বছর তার মেয়ে হল। হয়েই মারা গেল মেয়েটা। মুরের কাছে শুনে তারা লুকিয়ে দেখতে গিয়েছিল। কানাচে দাঁড়িয়ে দেখে এলো।—ওমা গেলাম, ওমা আর পারিনে। শুনলে চোখে জল এসে যায়। বুধিও হয়তো অমনি করত। কিন্তু কথা বলতে পারে না—কি করবে, বড় বড় চোখ মেলে ড্যাব-ড্যাব করে চেয়ে থাকে শুধু। কাছে গিয়ে তারা গরুর কপালে হাত বুলিয়ে সাহস দিচ্ছে: ভয় কি রে! রাজপুত্তুরের মতো বাছুর হবে দেখিস। হাম্বাহাম্বা করে ডাকবে।

দু-শিঙের মাঝে হাত বুলিয়ে দিলে বুধি আবার মুখ নামিয়ে ঘাস খুঁটতে লাগল।

ভাত বেড়ে নির্মলা ওদিকে চেঁচাচ্ছেন: হতচ্ছাড়ি মেয়ে আবার কোথায় গিয়ে মরে রইলি?

শাশুড়ি করকর করে ওঠেন: ছিঃ বউ, তোমার মুখ না খড়া? নাওয়া-খাওয়ার মুখে মরাচ্ছ তুমি এখন মেয়েটাকে?

নির্মলা ঠিক জানেন, মেয়ে ঐ গরুর কাছে গিয়েই পুঁতে রয়েছে। খিড়কির পথে রাস্তা অবধি চলে এসেছেন। এসে ডাকছেন, দুপুরবেলা বাঁশবনের নিচে দিয়ে একা-একা ঘুরিস, চুলের গোছা ধরে পেত্নীতে বাঁশগাছে টেনে তুলবে—তখন ঠিক হবে। ক্ষিধে-তেষ্টাও পায় না রে!

পেটের ক্ষিধের জন্য হোক অথবা পেত্নীর আতঙ্কে হোক, তারা ছুটে এসে ভাতের থালা নিয়ে বসে গেল।

ঠিক দুপুর। আর সকলের খাওয়া-দাওয়া চুকল, শুধুমাত্র নির্মলার বাকি। দুর্গার এই সময়টা পাড়ায় বেরুনোর সময়। পাড়া মানে ঐ জবেদ মিঞার বাড়ি। একটা বাড়িই শুধু কাছাকাছি, আর সব দূরে দূরে। সেকেলে মানুষ বড়গিন্নি যাই বলুন, ও-বাড়ির সঙ্গে ছাড়া-ছাড়া হয়ে থাকা যায় না। আয়েসা বউ, তার উপরে, হাসিখুশি আর বড্ড আমুদে। ভারি যত্ন করে। ডাক্তার-বাড়ির টিউবওয়েলে জল নিতে এসে ডেকে যায়ঃ যে ক'টা দিন আছ, একবার করে যেও দুগ্গা। শ্বশুরঘরে গিয়ে আর তো মনে থাকবে না।

দুর্গা যায়—যদু হালদারের মেয়ে খনা, আরও সমবয়সি ক'জন। গোবর-মাটি দিয়ে নিকানো তকতকে দলিচঘরে আয়েসা মাদুর পেতে দেয়। আস্ত পান, চুনের ঘট ও সুপারি-জাঁতি নিয়ে আসে। তাস খেলে ওরা, কড়ি খেলে, গল্পসল্প করে। জবেদের এক সময় বেহালার শখ ছিল, বেহালাটা আছে এখনো। আয়েসা বেহালা বের করে আনে। এই নতুন উপসর্গ—দুর্গা ছড় টানে বেহালার উপর। আনাড়ি বটে, কিন্তু মিষ্টি হাত, খাসা লাগে শুনতে। জবেদের জমি-জমা নেই, কিন্তু পয়সা রোজগারের নানা ফন্দিফিকির মাথায়। এক সময় এক-একটা নতুন ব্যবসা ধরে। ইদানীং গামালে বেরুচ্ছে। অর্থাৎ ডালায় করে রকমারি শৌখিন জিনিস ও মতিহারি-তামাক নিয়ে এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে ঘোরে। ঘুরতে হবে মরদেরা যখন কাজে বেরিয়ে

যায়। মেয়েলোক খদ্দের, অতএব মুনাফা ভাল। পয়সাকড়ির কেনাবেচা নয়—কেউ দু-আঁটি কোষ্টা এনে দিল, কেউ খুচিখানেক ধান, কেউ বা ডালকলাই। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে সুড়ুৎ করে দিয়ে যায়, মাপজোপের বালাই নেই। জবেদ গামালে থেকলে ধাড়ি তখন ফাঁকা। মেয়েরা জুটেপুটে চেঁচাক, লাফাক, বাজনা বাজাক—বলবার কেউ নেই।

কিন্তু বুধির জন্য আজকে জবেদের বেরুনো হয় নি। লাউয়ের মাচা বাঁধা শেষ করে এইবার জল খাওয়াতে এসেছে গরুকে। এসে দেখে, কী তাজ্জব, বাছুর হয়ে গেছে এর মধ্যে কখন।

বাছুর হয়েছে রে!

আয়েশা আর নুর ছুটে বেরিয়ে এলো। নুর কাঁঠালতলা থেকে এক লাফে রাস্তায় পড়ে ছুটল গোপেশ্বরের বাড়ি।

খাসা ফুলেবাছুর হয়েছে তারা, দেখে যা এসে। দেখে যা—

আঁচিয়ে এসে তারা আমতলায় ঘুরছিল। তলায় দু-একটা পড়েছে কিনা। অথবা ডালের উপর নাগালের মধ্যে পাকা-কাঁচা যদি কিছু পাওয়া যায়। নুরের ডাক শুনে উঠি-পড়ি করে তারা দে ছুট।

রান্নাঘরে খেতে বসেছেন নির্মলা। খোলা দরজায় চেয়ে চেয়ে তিনি দেখেন। মাঝের কোঠা থেকে গোপেশ্বরের গলা এলো: মাগো তারা ব্রহ্মময়ী! কই রে, কোথায় গেলি ও মা তারা?

অর্থাৎ দিবানিদ্রার আয়োজনে শুয়ে পড়েছেন তিনি, গড়গড়ার নল মুখে উঠছে।

নির্মলা জবাব দিলেন, সে কি আর বাড়িতে? যেখান থেকে ধরে নিয়ে এলে, সেইখানে আবার গিয়ে উঠেছে। নেহাৎ জবেদের ভাত খাওয়া যায় না, তাই ছুটো খেতে এসেছিল।

বল কি? মোটা রোজগার ছেড়ে বেরুল, সাংঘাতিক ত্যাগী মেয়ে তবে তো!

দুপুরবেলা বাপের পাকাচুল তুলে দেওয়া তারার কাজ। রেট খুব ভাল ছিল আগে—এক পয়সায় এক গণ্ডা। ইদানীং চুল বেশি পেকে যাওয়ায় রেট কমে গিয়ে পয়সায় দু-গণ্ডা হয়েছে। তা-ও খারাপ কিছু নয়, মনোযোগ দিয়ে খাটলে এক দুপুরে দুটো তিনটে পয়সা রোজগার।

দুর্গা খুটখুট করছে পূবের দালানে। গোপেশ্বর বললেন, ওরে দুর্গা, বসে যাবি নাকি সেই আগেকার মতো? কি বলিস? তুই বড়লোকের বাড়ির বউ—সামান্য দরে কাজ করবি কেন? তোর জন্য বিশেষ দর—পয়সায় সেই এক গণ্ডা করেই রইল।

নির্মলা আপত্তি করে ওঠেন: না, দুর্গা পারবে না। খনা ডাকতে এসেছে। ও যাক। আমি আসছি হাত ধুয়ে। পাকাচুল আমি তুলে দেব।

গোপেশ্বর হেসে বললেন, রক্ষে কর। তুমি তুলবে—পাঁকা-কাঁচা বোঝবার চোখ আছে তোমার? দুটো চারটে কাঁচা চুল যা আছে, তুলে সমস্ত সাবাড় করে দেবে।

দুর্গা এসে পড়ল। সে বলে, মা'র কথা শুনো না বাবা। আমার কাজ আমি করব। আগে আমিই তো করতাম—তারপর যেন তারাকে দিয়ে দিলাম। ও-মাথা আমার আর তারার। মা ছুঁয়ে দেখুক না একবার—

কি করবি? ক্ষেতের ঘাস নিংড়াবার মতন চুলগুলো সমস্ত উপড়ে দিবি নাকি মায়ের উপর রাগ করে?

দুর্গা বলে, মা-র যা কাজ, মা করুক। এদিকে নজর দিতে না আসে। সত্যিই ভাল হবে না তা হলে।

বলে সে বাপের শিয়রে বসল। সত্যি সত্যি ভয় পেয়েছে যেন জায়গা বেদখলের আশঙ্কায়। তেমনি ভাবে চেপে বসল।

রকম দেখে হাসতে হাসতে গোপেশ্বর বলেন, কিন্তু খনা যে ডাকতে এসেছে মা।

এসেছে, ফিরে চলে যাক। কাজকর্ম সেরে তারপরে আমি যাব। অবেদ-চাচারাও তো এখন গরু-বাছুর নিয়ে ব্যস্ত। খনা না হলে আমি ও-বাড়ি চিনে যেতে পারব না বুঝি?

গোপেশ্বর সজোরে ঘাড় নেড়ে বলেন, তুই যা এখন দুর্গা। বলছি, তুই চলে যা। ঘুম ধরেছে, আমি ঘুমব। পাকা চুল পালিয়ে যাচ্ছে না, কাল হবে।

বলেই নিদ্রার আবেশে চোখ বুজে পড়লেন। এর পরে কি করে আর দুর্গা? মেয়ে চলে যেতে গোপেশ্বর চোখ মেলে হা-হা করে হাসতে লাগলেন: এতকাল মানুষ করে মেয়ে পরঘরি করে দিলাম। ক'দিন বা থাকবে? যদ্দুর পারি সেবা-টেবা নিয়ে হিসাব চুকাতে চাই। তোমার সেটা সহ্য হয় না নিমু, বাগড়া দিয়ে এসে পড়।

খাওয়া সেরে নির্মলা এসে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, আমিও তাই বলছি। থাকতে দেবে ক'দিনই বা! নিয়ে গিয়ে দাসীবৃত্তি-চেড়ীবৃত্তি করাবে। যে ক'টা দিন আছে কাজকর্মে ওকে ডেকো না, আমোদ-ফূর্তি করে বেড়াক। যে বয়সের যা।

অ্যাঁ, দাসীবৃত্তি করায় নাকি বিয়ের পর? একজন দাসী এই তুমি যেমন? এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে নিয়ে গোপেশ্বর বললেন, দেখ, দুঁদে স্বভাবের জন্যে আমায় সেকালে বলত বাঘ। শ্রীচরণের দাসী হয়ে এসে তুমি সেই বাঘের গলায় দড়ি পরিয়ে ঘাস-বিচালি খাওয়াচ্ছ।

হাসতে লাগলেন গোপেশ্বর। কিন্তু নির্মলা হাসেন না: সে তোমার ঐ হাঁদা মেয়ে নয়। পরের ছেলে বশ করতে সাধ্য-সাধনা করতে হয়। ও-মেজাজে তা হবে না।

ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বলতে লাগলেন, শতেক খোয়ার আছে মেয়ের কপালে। আমরা দেখে দিলে কি হবে, বিধিলিপি খণ্ডানো যায় না। আপন ভাল পাগলেও বোঝে। ও হতভাগী একটা কথা যদি কখনো নেবে আমার!

গোপেশ্বর বলেন, এই সেদিন মোটে বিয়ে হয়েছে—ভাল করে আলাপ-পরিচয় হল না। এরই মধ্যে তোমার আকাশ-পাতাল ভাবনা। সোনার ছেলে নিরঞ্জন, ও-ছেলের হাতে মেয়ে কোনদিন দুঃখ-কষ্ট পাবে না, তুমি দেখো।

সোনার ছেলে—তা সে একশ' বার, হাজার বার। চেহারায় রাজপুত্র। কলকাতায় কলেজে পড়ে, পাশ করে উকিল হয়ে বসবে।

নির্মলা বললেন, ছেলের কথা হচ্ছে না। পরের ছেলের দোষ ধরে কি হবে? মেয়ে যে বাঁদর। কোন লগ্নে দেখা—যেন চাল আর তেঁতুল। কত জন্মের শত্রুতা যেন দুজনের মধ্যে।

জানলার বাইরে হঠাৎ নজর পড়ে গেল। বলেন, পিওন এসেছে। দেখে আসি।

সেই গেলেন, ফিরে আসার নাম নেই। গোপেশ্বরের ইতিমধ্যে ঝিমুনি এসেছে, হাতের নল পড়ে গেছে।

তারাকে তো বকুনি দেন, আর দেখ এবার সেই নির্মলার কাণ্ড। পিওন খামের চিঠি দিল, চিঠি কাপড়ের ভিতরে নিয়ে এক রকম ছুটতে ছুটতে তিনিও জবেদের উঠানে। বাছুর দেখতে এসেছেন। খোওয়া হাতের জল শুকোয় নি এখনো। বকতে যান আবার উনি। দুর্গারাও ছিল কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে। কিন্তু দলিচঘরের কাজকর্ম বোধ হয় অধিক জরুরি—ভিতরে ঢুকে পড়েছে। ছ্যাঁচা-বেড়ার আড়াল থেকে হাসির উচ্ছল টুকরো কানে আসে।

খাসা বাছুরটা। লালচে রঙের। গায়ে রোদ পড়ে ঝিকমিক করছে। নির্মলা বলেন, রোদে বাছুরের গা তেতে যাচ্ছে। ছায়ার ওদিকে সরিয়ে দাও জবেদ। বাঁশঝাড়ের ওদিকে।

তারা বলে, বাছুরের গা অত চাটছে কেন মা?

চেটে চেটে গায়ের নোংরা নালঝোল সাফ করে দিচ্ছে।

মুখ বিকৃত করে তারা বলে, হ্যাক-থুঃ!

নির্মলা হেসে বললেন, বড় যে ঘেন্না! হোক নিজের ছেলেমেয়ে, তখন দেখা যাবে। গায়ের নোংরা-ময়লা তুইও চেটে তুলবি এই রকম।

দেখ মজা। এই তো পেট থেকে পড়ল কতক্ষণ আগে—ওমা মা, ফুলেবাছুরের আস্পর্ধা দেখ। উঠে দাঁড়াবে।

ফুল বলে, পারছে কই?

নির্মলা বললেন, তোদের কত মাস লেগেছিল উঠে দাঁড়াতে? ক-বছরে হাঁটতে শিখলি? গরুর ক্ষমতা কত বেশি, দেখ তবে বুঝে।

ছায়ায় বাছুর সরাবে কি—বুধি যেন আর এক রকম। ফোঁস করে তেড়ে আসে জবেদের দিকে। এমন শান্ত গরু—একটুখানি আগেও তো তারা কপালে হাত বুলিয়ে দিল, পোষা কুকুরের মতো মাথা নিচু করে ছিল সেই সময়টা। মা হয়ে দেমাকে বুধির মেজাজ বিগড়ে গেছে।

দিবানিদ্রা ভেঙে চোখ মুছতে মুছতে গোপেশ্বরও অবশেষে এসে পড়লেন: কি বাছুর হল রে? দেখিস নি ল্যাজ তুলে?

বুধির শিং এঁটে ধরে জবেদ। তবে বাছুর পরখ করা গেল। মুখ বাঁকিয়ে গোপেশ্বর বললেন, এ্যাঃ, এঁড়ে-বাছুর।

কথা ছিল, বকনা হলে পাবে দুর্গা। বড়গিন্নি তাই বলে রেখেছিলেন। জবেদ দাম নিয়ে বাছুর ছেড়ে দেবে দুর্গার জন্যে। এমনি কথাবার্তা হয়েছিল। দুর্গা শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাবে। কিন্তু হল এঁড়ে-বাছুর—গৃহস্থের যা কাজে আসে না।

মাটির গামলায় ফ্যান আর কুঁড়ো মিশিয়ে আয়েসা বউ বুধির মুখের কাছে এনে ধরে। গোপেশ্বরের কথায় সে হেসে ফেলল: ছেলে হলে, ডাক্তার বাবু, মানুষের কত আহ্লাদ! গরুর তেমনি বকনা হলে। মানুষের উল্টো হল গরু।

জবেদ বলে, কেন, এঁড়ে-বাছুর ফেলনা হল কিসে? থুঁড়ো না তোমরা। আমার বাছুর আমারই থাকবে। গামাল ছেড়ে লাঙল করব। চাষের কাজে মজা কত। এঁড়েই ভাল আমার কাজকর্মে।

বুধি-গরু গোপেশ্বর ডাক্তারের। কেষ্টী নদীর ওপারে বক্তার বলে এক গৃহস্থের ছেলে টাইফয়েড বিস্তর দিন ভুগে সুস্থ হয়ে উঠল। গোপেশ্বর চিকিৎসা করেন। অন্নপথ্যের দিন বক্তার ডাক্তারের বাড়ি মস্তবড় সিধে পাঠালেন। আর এক বকনা বাছুর দিতে চান—এই বুধি। বললেন, ভাল জাতের গরু, ওর মা খুব শান্তশিষ্ট। গাভিন হলেও দুধ বন্ধ হয় না। বুধিও বড় হয়ে ঠিক তেমনি হবে। নিয়ে দিন ডাক্তারবাবু—আপনার ছেলেপুলেরা দুধ খাবে, আমার ছেলের ভাল হবে তাতে।

নতুন বখেড়া গোপেশ্বর নিতে চান না। দেশের অবস্থা দিনকে-দিন খারাপ হচ্ছে। লোকজন মেলে না। বেশির ভাগই মুসলমান চাষী—চাষবাস করে, জনকিষাণ খাটে। তাদের মধ্যে একটা রব উঠছে, হিঁদুবাড়ি কাজকর্ম করা চলবে না। এখন কেউ বড় কানে নিচ্ছে না, কিন্তু হাওয়ার গতিক বোঝা যাচ্ছে তো! বড়গিন্নিরও আপত্তি: গরু পোষা একটা ছেলে মানুষ করার চেয়ে শক্ত। কাজ নেই বাপু ভগবতীর শাপমন্যি কুড়িয়ে। এমনি টালবাহানা চলছিল, জবেদ শুনে বিষম ধরাধরি করতে লাগল: আমায় পোষানি দেবেন ডাক্তারবাবু, আবার বাড়ি থাকবে। আপনাদের চোখ তুলে চেয়ে দেখতে হবে না। জবেদের সঙ্গে ভালবাসাবাসি আজকের নয়। সে যখন ভার নিচ্ছে, তখন আর কি! গরু এনে সোজাসুজি জবেদের বাড়ি তুলে দেওয়া হল।

গরুর মালিক অতএব গোপেশ্বর। জবেদকে পোষানি দেওয়া। নিয়ম হল, যে পুষছে পয়লা বাছুর সেই লোকে পাবে। আর দৈনিক দুধ যা হবে, তার অর্ধেক। পরের বিয়েনে দুধের যেমন অর্ধেক, বাছুরেরও তাই। গরুর মালিক ইচ্ছে করলে অর্ধেক পরিমাণ দাম দিয়ে সেই বাছুর নিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু সে সমস্ত পরের কথা। এই মুলেবাছুর এখন ষোল-আনা জবেদের। একটা দাম ধরে দিয়ে

দুর্গার জন্যে নেওয়া হবে কথা হয়েছিল, কিন্তু এঁড়ে-বাছুরে আবশ্যক নেই।

গোপেশ্বর বললেন, জোলাম পড়ে নি বুঝি এখনো? পড়বে এইবার। তুই জবেদ জিঙলের কচা ভেঙে আন একটা। গাইটাকে ঠ্যাঙ্গা করে পেটাবি, নয়তো ঠেকানো যাবে না, জোলাম খেয়ে নেবে। তা হলে বাঁটের দুধ শুকিয়ে যাবে। জোলাম ফেলে দিয়ে তারপরে নড়বি এই জায়গা থেকে।

দাঁড়াতে গিয়ে পা টলে বাছুরের। আমিনুর স্ফূর্তি দিচ্ছে: চার-চারটে পা রয়েছে, ভাবনা কি তোর? আমাদের মতন দু-খানা তো নয়—ঠিক পারবি। বাছুর পড়ে পড়ে যায় উঠতে গিয়ে। খিলখিল করে তখন হেসে ওঠে: দূর মুখ্যু, তাড়াহুড়ো করে ও-রকম! সামাল হয়ে—হ্যাঁ পায়ের উপর ভর রেখে—হয়েছে, হয়েছে—

হাততালি দিয়ে ওঠে নুর। তারা বলে, কি বার আজকে? বুধবারে হয়েছিল বলে ওর মায়ের নাম বুধি।

নুর ঘাড় নেড়ে বলে, উঁহুঁ, বারের নামে নয়। সোনার বরণ বাছুর—নাম থাকল ওর সোনা। বুধির বেটা সোনা—সোনামণি আমাদের।

বাড়ি ফিরে গোপেশ্বর জামা-জুতো পরছেন। বেলা পড়ে আসে। হাটখোলায় ডাক্তারখানা, সেইখানে গিয়ে বসবেন এবার। নির্মলা এতক্ষণে খামের চিঠি এনে হাতে দিলেন। জলে ভিজিয়ে সাবধানে খাম খোলা। বলেন, মিছে কি সত্যি বলেছিলাম পড়ে দেখ এই চিঠি।

ঠিকানা পড়ে গোপেশ্বর জিভ কাটেন: এ তো নিরঞ্জন লিখেছে দুর্গাকে।

নির্মলা তর্জন করে ওঠেন: হ্যাঁ লিখেছে। চোখ বুজে থাকলে হবে না। কি লিখেছে তাই পড়তে বলছি।

এই বয়সে কত কি আবোল-তাবোল লেখে, সে কি আমাদের পড়বার জিনিস? গোপেশ্বরের গোঁফের ফাঁক দিয়ে একটু হাসি ফুটে বেরুল। বলেন, মনে করে দেখ নিমু, আমাদেরও বয়স ছিল। আমাদের চিঠিপত্তর যদি কর্তারা চুরি করে দেখতেন, কি রকমটা হত ভাব দিকি!

নির্মলা বলেন, আমরা আর এরা! ভালবাসা কি বস্তু, এরা তা জানে নাকি? কাঁচা বয়স—ওদের আমরা জানি বলে তাই। নয়তো চিঠি পড়ে যে-কেউ বলবে, ত্রিকালের কোন জরদ্গব বুড়ো নাতনীকে হিতোপদেশ পাঠাচ্ছে—.

রাগে তরতর করে ভিতরের চিঠি বের করে ফেললেন। চিঠি এগিয়ে ধরলেন একেবারে গোপেশ্বরের মুখের উপর।

দেখছ, পাঠ দিয়েছে 'মাননীয়াসু'। 'আপনি' 'আপনি' করে লিখছে—

গোপেশ্বর হাসেন, নির্মলা চটে যান ততই। হাসি থামিয়ে গোপেশ্বর বললেন, তাই দেখ, আজকালকার শিক্ষিত ছেলে মহিলার কেমন মর্যাদা দেয়। ক-মাস মোটে বিয়ে হয়েছে, অভ্যেস এখনো কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

বলতে বলতে হি হি করে আবার হেসে উঠলেন: আমি কত নিচে নেমে গিয়েছিলাম, চিঠিতে তুই-তোকারি পর্যন্ত করেছি। নয় নিমু?

খুব হাসছেন তিনি। হাসি সংক্রামক। নির্মলার রুষ্ট চোখ একটু যেন ঝিকমিকিয়ে ওঠে। মৃদু কণ্ঠে বলেন, তা বলে একেবারে তোমার মতন বেহায়া-বেলাজ না হয়! চিঠির পাঠই চলত একনাগাড় আড়াই-তিন লাইন। কী কাণ্ড!

চুলে একটা-দুটো পাক ধরেছে নির্মলার। দেবী-প্রতিমার মতো অমন মুখে খাঁজ পড়ে যাচ্ছে। কতকাল আগের সে-সব কথা—

বলতে বলতে কণ্ঠ তবু স্নিগ্ধ হয়ে আসে। গোপেশ্বর চিঠিটা হাতে নিয়ে নিলেন। পড়লেনও দু-চার ছত্র। না, নির্মলার রাগ অকারণ নয়, মেয়ে-জামাইয়ে ভাব হয় নি। এর আগে নিশ্চয় কড়া কড়া লিখেছিল দুর্গা, তারই জবাব। সেই কড়া চিঠিরও হেতু অনুমান হচ্ছে—বেচারা নিরঞ্জন বউকে পাঁচারই গাঁয়ে তাদের বাড়ি নিয়ে যাবার প্রস্তাব করেছিল। উঃ, কী সব হচ্ছে এখনকার এরা! লেখার বাঁধুনিটা দেখ না—তোম ভি মিলিটারি, হাম ভি মিলিটারি। প্রেমপত্র বলে ভাবছিলেন, কিন্তু এ যেন দুই সেনাপতির লড়াইয়ের পাঁয়তারা।

-

পাড়া বেড়ানো সেরে দুর্গা ফিরে এল। তখন বেলা পড়ে এসেছে। এসে সাবান-তোয়ালে নিয়ে খিড়কি-পুকুরে গা ধুতে চলল। সেখানেও আড্ডা আর এক দফা। পাড়ার মেয়ে-বউরা এসে জমছে—গা ধোওয়া, কাপড় কাচা, কলসি ভরে জল নিয়ে যাওয়া। চলল এখন রাত এক পহর অবধি।

নির্মলা বললেন, চিঠি—

খাম পুনশ্চ এঁটে দিয়েছেন। দুর্গা বাঁ-হাতের দুটো আঙুলে চিঠিটা ধরে এক নজর দেখল। তারপর খাটের উপর রেখে দিয়ে ধীর-পায়ে বেরিয়ে গেল।

নির্মলার ধৈর্য রাখা দায়। এর পরে তো চিৎকার করে বলতে হয়, পড়ে দেখে যা হতভাগী। কিন্তু বলেন কী করে—তবে তো প্রমাণ হয়ে যায়, জামাইয়ের চিঠি চুরি করে পড়েছেন তিনি। বিস্তর কষ্টে অতএব রাগ চেপেচুপে থাকতে হয়।

তারপরে ধীরেসুস্থে গা ধুয়ে দুর্গা ঠাকরুন পুকুরঘাট থেকে বাড়ি ফিরলেন। ফিরে এসে রান্নাঘরে ঢুকে চায়ের বাটি নিয়ে বসেছেন। খামের চিঠি তেমনি পড়ে আছে খাটের উপর, ভুলেই গেছেন সম্ভবত। নির্মলা সে সময়টা এদিকে ছিলেন না, ঘরের মধ্যে বালিশে ওয়াড়

পরাচ্ছিলেন। এসে দেখেন এই কাণ্ড। গতিক বোঝ একবার! স্বামী বলে ভয়-ভক্তি চুলোয় যাক, এতদূর তুচ্ছতাচ্ছিল্য! চিঠিটা খুলে দেখল না—তার ভিতরে সাপ আছে না ব্যাঙ আছে। মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো এবং ধেড়ে করে বিয়ে দেওয়া আজকাল ফ্যাশান হয়েছে। ওই হয়েছে কাল। আমাদের সময় ছিল 'পতি পরম গুরু'—পতি মুখ বেজার করলে জগৎ অন্ধকার। ওরা এখন জেনে বসে আছে, একটা পাশ দিতে যাচ্ছে, মেয়ে-ইস্কুলে তিরিশ টাকার মাস্টারি ঠেকায় কে? পুরুষমানুষকে তাই কেয়ার করে না।

গম্ভীর তীক্ষ্ণস্বরে নির্মলা জিজ্ঞাসা করলেন, নিরঞ্জন আছে কেমন রে? কি লিখল?

ও, হ্যাঁ, চিঠি এসেছে। আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।

খিলখিল করে দুর্গা হেসে উঠল: ভাল থাকবে বই কি মা, চিঠি তো খুব ভারীই ঠেকল। শরীর বেজুত হলে অত লেখা আসে না।

তা দয়া করে চিঠিটা খুলে পড় না। আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার দরকারটা কি?

তার উত্তরে পাজি মেয়ে কি বলে শুনবে? বলে, খাচ্ছি দেখতে পাও না? খেতে খেতে খোলা যায় কেমন করে? তুমি খুলে দেখ না এত যদি ব্যস্ত হয়ে থাক।

নির্মলা বললেন, বয়ে গেছে আমার।

ও-মেয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মেজাজ ঠিক রাখা যায় না। চলে গেলেন নির্মলা। দুর্গা নিশ্চিন্তে লুচির পর লুচি শেষ করতে লাগল।

মা-মেয়ের কলহ বড়গিন্নির কানে গেছে। আশি বছরের বুড়ি, হাঁপানির টান তার উপর। দরদালানের একপাশে দিন-রাত বিছানায় পড়ে আছেন। কিন্তু কান খুব তীক্ষ্ণ, সব কথা শোনেন, সংসারের সকল ব্যাপারের মধ্যে আছেন তিনি। দুর্গাকে ডাকছেন, শুনে যা দিদি। বউমা চটে গেল কেন? কি লাগিয়েছিস মায়ের সঙ্গে?

সমস্তগুলি লুচি গলাধঃকরণ করে, চা খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে এতক্ষণে খামের চিঠি খুলে পড়তে পড়তে দুর্গা ঠাকুরমার কাছে এলো। কড়কড় করে নালিশ জানায়ঃ দেখ তো ঠাকু-মা, মা মিছে করে বলছে। আমি নাকি হেলা করি তোমার নাতজামাইকে। সে চটে আছে—নাকি বিয়ে করবে আবার? এসব কি চটাচটির কথা, শোনই না—

চিঠির চার-পাঁচ লাইন পড়ে গেল। বলে, শুনলে?

বড়গিন্নি গম্ভীর হয়ে গেছেন। বললেন, বউমা ঠিকই ধরেছে, লক্ষণ ভাল নয়।

কী আশ্চর্য, কত খাতির করে লিখছে আমায়—

দৃষ্টান্ত স্বরূপ পুনশ্চ পড়ে শোনাতে যায়। বড়গিন্নি থামিয়ে দিয়ে বললেন, অতিভক্তি চোরের লক্ষণ। ভিতরে কিন্তু আছে রে দিদি। তিনটে মাস মোটে বিয়ে হয়েছে—ঘর করলি নে পুরুষমানুষের সঙ্গে, ওদের চিনবি কি করে? বড্ড ফিচেল জাত। যে-পুরুষ বকেঝকে, সময় বিশেষে চুল ধরে বা দুটো ঝাঁকুনি দেয় কিম্বা পিঠের উপর এক ঘা দেয় বসিয়ে—সে হল সোজা মানুষ, ভালমানুষ। তাকে নিয়ে ভয় নেই। শয়তান হল মুখমিষ্টি যাদের। অত মিষ্টি করে লিখেছে—নাতজামাই লোক সুবিধের নয় দিদি। বশে আনতে বেগ পেতে হবে।

ভয়ের ভান করে শুকনো মুখে দুর্গা বলে, তা হলে উপায়?

খুব কাতর হয়ে একখানা চিঠি দে। মাথার দিব্যিটিব্যি দিয়ে লেখ। সেকালে আমরা কত ভনিতা করে লিখতাম। আজকাল শুধু তোরা পাশই করিস, কিচ্ছু শিখিস নে। মেয়েমানুষের সকলের বড় হল সোয়ামি। সোয়ামির পাদোদক খাবি, পুজো করবি, সকালে ঘুম ভেঙে উঠে আসবার সময় পায়ে গড় করবি। আবার ওদিকে সে-পুরুষও উঠতে বললে উঠবে, বসতে বললে বসবে। পোষা বানর-ভালুকের মতো। তবে জানি বাহাদুর মেয়ে।

নাতনির দিকে কোটরের চোখ দুটো স্থাপিত করে বুড়ি প্রশ্ন করলেন, চিঠিতে কি পাঠ দিয়ে থাকিস ?

পাঠ ! ওঃ, চিঠির আরম্ভের কথা বলছ ? শ্রদ্ধাস্পদেষু কিম্বা সবিনয় নিবেদন। সেদিন অবধি তো একেবারে অজানা, তাকে আর কি লেখা যায় বল ?

বড়গিন্নি খিঁচিয়ে ওঠেন : হয়েছে, খুব হয়েছে ! শিখে নাও আমার কাছ থেকে। প্রাণেশ্বর, প্রাণবল্লভ, প্রাণকান্ত, হৃদয়েশ্বর— আরও বিস্তর আছে। মনে না থাকে তো টুকে নাও কাগজে। এক সঙ্গে দুটো তিনটে চারটে করে লাগাবে। তবে তো খুশি হবে পুরুষ। ছুটিতে এখন বাড়ি এসেছে, আসবার জন্য লিখে দাও। লেখো, বিরহিণী চাতকিনীর ন্যায় পথ চাহিয়া আছি। আজকাল ছবিওয়ালা চিঠির কাগজ বুঝি পাওয়া যায় না রে ? ভাল ভাল পদ্য থাকত—'যাও পাখী বোলো তারে সে যেন ভোলে না মোরে' ! নাঃ, ন্যাড়া কাগজে আঁখর বেঁধে কত আর জমানো যায় !

স্বামী বশ করার তুকতাক সেকালে বিস্তর চলিত ছিল, তার ভিতরের মোক্ষম কয়েকটি নাতনিকে বুঝিয়ে দিলেন। জেনেবুঝে ঘাড় নেড়ে দুর্গা চলে গেল।

গোপেশ্বরের ডাক্তারখানা বাজারের উপরে। বিকালবেলা সেখানে গিয়ে বসেন। রোগির বাড়ি ডাক এলে সাইকেলে এবং বর্ষাকালে ঘোড়ায় সেখান থেকে বেরিয়ে যান। বেগীর উপরে প্রাচীন মন্দির ও দেবস্থান—শিববাড়ি। চৈত্র-সংক্রান্তির দিন থেকে সেখানে মেলা বসেছে। এক মাস চলবে। পুরনো মেলা, বিস্তর নাম। এই তল্লাটের উৎকৃষ্ট কাঠের কাজ বাঁশের কাজ ও বেতের কাজ আমদানি হয় মেলায়। অনেক দূর থেকে লোকজন এসে জমে, শিক্ষিত ও গুণীলোকেরাও

অনেকে আসেন। লোক জমলে রোগপীড়া হবেই—ডাক্তারের মজা সেই মজা ইতিমধ্যেই জমে উঠেছে। ডাক্তার আসছে রোজ লেখাল থেকে।

মেলার রোগি দেখে ডাক্তারখানায় নিয়মিত দু-বাজি দাবাখেলার পর বাড়ি ফিরতে গোপেশ্বরের আজ অনেক রাত্রি হয়ে গেল। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, নির্মলা কেবল ঘর-বার করছেন। অর্থাৎ ধরবেন চেপে এইবার—খাওয়া সেরে গড়গড়া নিয়ে বসতে যেটুকু দেরি। কিন্তু সেটুকুও আজ ফুরসৎ দিলেন না। আঁচলের তলা থেকে নির্মলা চিঠির প্যাড বের করলেন—সত্ত সত্ত অনেকখানি লেখা। ভ্রূভঙ্গি করে বললেন, জবাব যাচ্ছে, দেখ—

বেশ, বেশ। চিঠি পেয়েই জবাব দিচ্ছে, রাগ দেখে তবে ভয় হয়েছে দুর্গার।

তেমনি মেয়ে বটে তোমার! মা একবেলা ধরে টিয়া পড়ান পড়ালেন, বিছানা করতে করতে সমস্ত আমার কানে গেছে, চিঠির কত রকম পাঠ বলে দিলেন। লজ্জার মাথা খেয়ে মা হয়ে আমিও কত বললাম—হুঁ-হুঁ করে দিব্যি শুনে গেল, হাসল না, একটা জবাব দিল না। খেয়েদেয়ে তারপর সত্যি সত্যি বসে গেল লিখতে। ভাবলাম, সুমতি হয়েছে। লিখলও অনেকক্ষণ ধরে। ঘুমিয়ে পড়লে তখন টিপিটিপি বের করে দেখি—হায় আমার কপাল—

খাওয়া-দাওয়া অন্তে কতক্ষণে গোপেশ্বর নিজে পড়বেন, অতদূর সবুর সয় না। নির্মলাই পড়ছেন এক একটা জায়গা থেকে। রাজার নন্দিনী প্যারী কি বাণী ছেড়েছেন শোন একবার।—আপনাকে এখানে আসিবার জন্য ঠাকুরমা আমায় লিখিতে বলিলেন। আরও বলিলেন, পাখি হইলে উড়িয়া চলিয়া যাইতাম—এই কথা লিখিতে। কিন্তু আপনি ছুটিতে কয়েকটা দিনের জন্য বাড়ি আসিয়াছেন, কোন বিবেচনায় আপনাকে আসিতে লিখিব? মা ভয় দেখাইতেছেন, আপনি

শাস্তি আবার বিবাহ করিবেন। আপনার ইচ্ছা হইলে কেমন করিয়া তাহা নিবারণ করিব…

নির্মলার ধৈর্য থাকে না। ফ্যাস-ফ্যাস করে চিঠি ছিঁড়ে কুচিকুচি করলেন। বললেন, যে কথা বলেছি, ঠিক তাই। এত অপমান কোন পুরুষছেলে সইতে পারে না। সতীন আছে ঠিক ওর কপালে। রাগের মাথায় বিয়ে করে বসবে।

গোপেশ্বর অবশ্য অতদূর বিচলিত নন। হেসে বললেন, ছেলেরা আজকাল খুব সেয়ানা। একটা বিয়েই করতে চায় না। এই নিরঞ্জনকে দিয়ে দেখ। লগ্নপত্তোর হয়ে গেছে, তার পরেও শতেক বায়নাক্কা। যাচ্ছে সেই ছেলে আর একবার বিয়ে করতে!

বিবাগী হয়ে তবে হিমালয়ে চলে যাবে।

সেটা হতে পারে। যাতায়াতের অসুবিধা নেই এখন। বাস-সার্ভিস হয়েছে, পায়ে হেঁটে মরতে হয় না। জায়গা ভাল, ঘি-আটা ভালই মেলে শুনেছি।

নির্মলা চটেমটে চলে গেলেন। কথাগুলো হাসতে হাসতে বললেন বটে গোপেশ্বর, কিন্তু মনে মনে ভাবনা। সত্যিই তো, নতুন বিয়ের পরে কী সব বিদঘুটে ব্যাপার! আবার বিয়ে করবে, সে অবশ্য কাজের কথা নয়—কিন্তু বয়স আর মেজাজের দোষে উগ্র চিঠি-লেখালেখি করে বেচারিরা মনে মনে বিষম কষ্ট পাচ্ছে। বাপ-মায়ের উচিত হচ্ছে বুঝিয়েসুজিয়ে ঠাণ্ডা করে দেওয়া।

মেয়ে না লিখুক, গোপেশ্বর নিজেই লিখলেন নিরঞ্জনের বাপ হরনাথের কাছে। ইনিয়ে-বিনিয়ে মুশাবিদা করে লিখলেন: আমার মা একেবারে অথর্ব হইয়া পড়িয়াছেন। কবে আছেন, কবে নাই। নাতজামাইকে লইয়া কয়েকটা দিন আমোদআহ্লাদ করিবার বড়ই ইচ্ছা। আপনার বধূমাতার পরীক্ষা সমাধা হইয়া গিয়াছে। বাবাজীবন যখন ফিরিয়া যাইবেন, আপনার আদেশ হইলে, শ্রীমানের

সঙ্গে দুর্গাও পাঁচারই গিয়া শ্বশুর-শাশুড়ির চরণ-সেবার জীবন সার্থক করিবে। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

দিন আষ্টেক পরে পুলকিত গোপেশ্বর স্ত্রীকে জানালেন, জামাই আসছে—যোগাড়যন্তোর কর। বেহাইকে লিখেছিলাম মা'র হাঁপানির অসুখের দোহাই পেড়ে। খুব কাজ দিল। মেয়ের দোষ জামাইকে আদরযত্ন করে ভুলিয়ে দেব। ভাব করিয়ে দিতে হবে দু'টিতে।

দুর্গার তা বলে গ্রাহ্য নেই। গয়ংগচ্ছ ভাব: তোমাদের জামাই আসছে, আমি তার কি করব? ধিতিং-ধিতিং করে নাচতে বল আমায়?

মায়ের কাছে গিয়ে দুর্গা সোজাসুজি বলল, জামাই এসেছে—সেই নাম করে তোমরা যে বাড়িতে আমায় ঠায় বসিয়ে রাখবে, তা হবে না কিন্তু।

নির্মলা উষ্ণ কণ্ঠে বলেন, কোন্ বৃহৎ কাজ আছে শুনি? স্বামীর সেবাযত্ন করা—এর চেয়ে বড়-কিছু আছে মেয়েমানুষের?

ঠোঁট ফুলিয়ে দুর্গা বলে, হিমিদের বাড়ি যেতে হবে না সেদিন? তোমায় তো বলে রেখেছি।

নির্মলার কিছুই মনে পড়ে না। বললেন, হিমিটি আবার কোন্ লাটসাহেব?

ধূলগাঁর হিমি। খনার মাসতুতো বোন। খনাদের বাড়ি এসে একদিন আমাদের এখানেও তো এসেছিল। ভুলে গেলে?

তবু নির্মলার মনে পড়ে না। দুর্গা বলে, হিমির বিয়ে যে ওই দিন।

নির্মলা কড়া হয়ে বললেন, ধূলগাঁয়ে যাবার মতলব বুঝি? জামাই আসছে, সেদিন তোমার কোনখানে যাওয়া হবে না। স্পষ্ট কথা। পায়ে শিকল পরিয়ে রাখতে হয়, তাতেও আমি পিছপা হব না।

ওখানে সুবিধা হল না তো দুর্গা বাপের কাছে গিয়ে পড়ে।

মা'র অন্যায় দেখ বাবা। হিমির বিয়ে কি রোজ রোজ হবে? অঘ্রাণ মাসে এসেছিল, সেই সময় আমাদের কথাবার্তা। ধূলগাঁ

কতটুকু পথ বল, বেশী পার হয়ে গিয়েই তো! খনা আর আমি চলে যাব। তুমি মানা কোরো না বাবা।

গোপেশ্বর বলেন, কিন্তু নিরঞ্জন আসছে যে মা। আমি এত চিঠি-পত্তোর লিখে তাকে নিয়ে আসছি।

তুমি লিখেছ, তা তুমি থেকো বাড়িতে। ও-দিনটা ডাক্তারখানায় যেও না। আমায় জিজ্ঞাসা করে তো চিঠি লেখ নি, তা হলে আমি মানা করে দিতাম।

শোন কথা পাগল মেয়ের! বয়স হয়েছে তা কে বলবে, একেবারে কচি খুকি তুই মনে মনে।

গোপেশ্বর প্রশ্রয়ের হাসি হাসতে লাগলেন। বলেন, আমরা তো থাকবই, কিন্তু তাতে হয় না মা। অবিশ্যি তোর কথাও মিথ্যে নয়, হিমির বিয়ে ওই একবারই হচ্ছে। এত ভাবসাব তোদের! এক কাজ কর—দুটো দিকই যাতে বজায় থাকে। বিয়েবাড়ি সকাল সকাল চলে যাবি, নিরঞ্জন পৌঁছবার আগে, এই ধর পাঁচটায়। সাতটার ভিতর ফিরে আসবি। বলিস, ঠাকুরমার অসুখ। ওই তো আছে আমাদের এক কথা, সর্বকর্মে লাগিয়ে দিই।

দুর্গা আবদার ধরে, না বাবা, ন'টা। বিয়েবাড়ি কত লোকজন আসবে—ঠিক অমন ঘড়ি-ধরা হিসাব চলে না। ন'টা পর্যন্ত কথা রইল, তার আগেই চলে আসব।

উঁহু, নতুন জামাই—চটে-মটে যাবে। আচ্ছা, তোর কথা থাক, আমার কথাও থাক। আটটা—ব্যস ব্যস, তার উপরে সিকি মিনিটও আর নয়। আটটা অবধি বাবাজীবনের সঙ্গে 'কেমন আছ' 'ভাল আছি' করতে করতে যেমন করে হোক আমি কাটিয়ে দেব।

জামাই এল। সে সময়টা গোপেশ্বর খিড়কি-পুকুরে ছিলেন মাছ-ধরার ব্যাপারে। খবর পেয়ে ছুটে এসে পড়লেন।

এস বাবাজী, এস এস। পথে কষ্ট হয় নি তো কোন রকম ?

হাত-মুখ ধোওয়া ও জলযোগ পর্ব শেষ হল। গোপেশ্বরের সেই 'কেমন আছ' ইত্যাদি চলছে এখনো। কিন্তু উসখুস করছে নিরঞ্জন, কথার জবাব ভাল করে দেয় না। কেন তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। আটটা অবধি সামলাবেন, গোপেশ্বর বলেছিলেন। কিন্তু সাড়ে-ছটা না বাজতেই এই গতিক। লক্ষ্মীছাড়া মেয়ের আজ বিয়ে দেখাটাই বড় হল। বিয়ে যেন আর দেখে নি। নিজের বিয়েই তো ওই সেদিন হয়ে গেল—ফূর্তিফার্তি করলি, খাওয়া-দাওয়া হল, তা লোভের কিছুতে শেষ নেই।

সাঁ করে গোপেশ্বর একবার ভিতরের দিকে এলেন। বড়গিন্নি চোখ বুঁজে নিঃসাড় হয়ে আছেন দরদালানে তাঁর তক্তাপোষখানার উপর। কাল রাত্রে টানটা বেড়েছিল। ঘুমুচ্ছেন এই ভর সন্ধ্যেবেলা। আহা ঘুমান, শরীরটা এখন ভাল আছে বোঝা যাচ্ছে। চলে এলেন তিনি রান্নাঘরে।

নির্মলা জামাইয়ের জন্যে লুচি ভাজছেন। গোপেশ্বর নিচু কণ্ঠে বললেন, আর তো সামলানো যায় না। কথাবার্তা কিছুই ওর কানে ঢুকছে না। বলছি এক, জবাব দেয় অন্য। ফালুক-ফুলুক করে তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক।

নির্মলা ঝাঁঝের সঙ্গে বলেন, হবেই তো! আহ্লাদ দিয়ে দিয়ে মাথাটা খেয়েছ মেয়ের। আমার তাড়া খেয়ে তোমার কাছ থেকে হুকুম নিয়ে চলে গেল। বোঝগে তুমি, আমায় কেন বলতে এসেছ ?

কাঁচা ঘি খানিকটা কড়াইতে ঢেলে দিলেন। কলকল করে উঠল। নির্মলার কথা ডুবে গেল আওয়াজে।

গোপেশ্বর একলা কাঁহাতক বকবক করেন! তারা আসুক। হোক ছেলেমানুষ—তবু সম্পর্কে শালী। দলবল নিয়ে এসে হাস্টিনষ্টি করুক জামাইয়ের সঙ্গে। তারার তল্লাসে বাইরের দিকে

চললেন। হতভাগা মেয়ে সব সময় বাইরে বাইরে। সংসারের কোন রকম যদি কাজে আসে! রাতদিন খেলা।

কলাবাগানের মধ্যে তারা। খুব ব্যস্ত। আমিন্থরকে কনে সাজাচ্ছে। বিয়ে-বিয়ে খেলা। পাড়ার আরও গুটি তিনেক মেয়ে আছে—আসল মেয়ে বর্তমান থাকতে মুরকে কনে বানাচ্ছে ফরশা রং এবং চেহারায় ছোটখাট গোলগাল বলে। মেয়ে হওয়াই মুরের উচিত ছিল, ভুল করে বেটাছেলে হয়ে জন্মেছে।

গোপেশ্বর এসে পড়লেন: এই, বাড়িতে জামাই—কি করছিস এখানে তোরা?

মুর লজ্জা পেয়ে অঙ্গের জড়ানো শাড়ি খুলে মালকোঁচা সেঁটে চক্ষের পলকে বেটাছেলে হয়ে গেল।

হাসি চেপে গোপেশ্বর বলেন, চলে আয়, এক্ষুণি আয়। গালগল্প করবি, লুচি-ছক্কা খাবি---তা নয় জঙ্গলের মধ্যে পড়ে পড়ে মশার কামড় খাচ্ছিস।

ঘাড় বাঁকিয়ে তারা বলে, গেলাম একবার তো! তুমি তখন পুকুরঘাটে।

গেলি তো পালিয়ে আবার জঙ্গলে এসেছিস কেন?

জামাইবাবু কেমন করে তাকায়। ওর চোখ ভাল না।

গোপেশ্বর বলেন, আর কিছু পেল না তো চোখের নিন্দে। তোর জন্যে এমনি চোখ-ওয়ালা ছেলে যদি পাই তো বর্তে যাবি, এই বলে দিলাম।

তারা বলে, চোখ দিয়ে যেন গিলে খেতে আসে বাবা। আমার ভয় করে।

সমস্ত ছুতো। খেলার নেশা এখন। দুটো বোনই এক ধাতের, বাড়িতে মন রয় না। আয় বলছি। চলে আয়।

তাড়া খেয়ে তারা বলল, যাচ্ছি—

দেরি করবি নে। এক্ষুণি আয়।

গজর-গজর করতে করতে গোপেশ্বর ফিরে এলেন। এসে দেখেন, নিরঞ্জন হাই তুলছে। বললেন, ক্লান্ত হয়ে পড়েছ বাবাজী। পথের ধকল। স্টেশনে নেমে তারপরে আবার এতখানি পথ পালকির মধ্যে কুঁজো হয়ে আসা। তারা এক দঙ্গল ছেলেপুলে নিয়ে আসছে এখানে। তা ওদের আমি তাড়িয়ে দেব। তুমি বাবা গড়িয়ে নাও একটু, শরীর ঠিক হয়ে যাবে।

নিরঞ্জন তখন যেন মরীয়া হয়ে বলে উঠল, আজ্ঞে না, আমাকে বেরুতে হচ্ছে একটু।

রাগের কথা। সত্যিই তো, কার না রাগ হয় খবরবাদ দিয়ে শ্বশুরবাড়ি এসে যদি বোঝা যায় শ্বশুরনন্দিনী উধাও ?

নিরঞ্জন বলে, মামার ওখানে যাব একবার।

নিরঞ্জনের মামা নন্দলাল ধর এই গ্রামের লোক। ও-পাড়ার বাসিন্দা। মামার বাড়ি নিরঞ্জনের বরাবর আসা-যাওয়া—বিয়ের সম্বন্ধ ঐ মামার বাড়ি থেকেই ওঠে।

গোপেশ্বর বলেন, যাবে বই কি বাবা! কিন্তু ধর মশায় আজ বাড়ি নেই। হালখাতার ব্যাপারে জমিদার-কাছারি গেলেন। রুগি দেখতে বেরিয়েছি, সেই সময় পথের উপর দেখা। তোমার স্বামীও এখানে নেই, সে তো জান। ভাইয়ের বিয়েয় বাপের বাড়ি গিয়ে আছেন।

এত সমস্ত খবর জেনে বসে আছেন, নিরঞ্জনের মুখটা কেমন হয়ে গেল শুনে। আমতা-আমতা করে বলে, মামার বাড়ি ঠিক নয়। মামার ব্যাড়ির পাশে ব্রতীনদের বাড়ি—একটা জরুরি খবর আছে ব্রতীনের জন্য। চাকরির খবর।

খুব ভাব ব্রতীনের সঙ্গে। মামার বাড়ি যাতায়াতের সূত্রেই। তারপর ব্রতীন কলকাতায় পড়তে গেল—এক মেসে থাকত দু'জনে।

অবস্থার গতিকে পড়া ছেড়ে দিয়ে ব্রতীন এখন গ্রামে এসে আছে। চাকরির জন্য এক নাগাড়ে দরখাস্ত ছাড়ছে, তা-ও ঠিক।

গোপেশ্বর সোয়াস্তি বোধ করেন। মন্দ হল না, একটা জায়গায় খুঁটো হয়ে না বসে ঘুরে ফিরে আসুক। যাওয়া-আসা এবং সেখানেও 'কেমন আছ' 'ভাল আছি' ইত্যাদিতে সময় দিব্যি কেটে যাবে। ওই আটটাই হয়ে যাবে ফিরে আসতে। দু-দশ মিনিট বেশি ছাড়া কম নয়। বললেন, ব্রতীনের বাপ আবার গল্পে মানুষ। জমিয়ে বসো না ওখানে। তাড়াতাড়ি ফিরো।

চলে গেল জামাই। যাওয়ার পরে নির্মলার কানে গেল। শুনে তিনি গালে হাত দিয়ে পড়লেন : কী সর্বনাশ! যাবে বলল, আর যেতে দিলে তাকে ও-বাড়ি? খবর দিলে তো ব্রতীনই এসে পড়ত। লোক পাঠিয়ে দিলে না কেন ব্রতীনের কাছে?

গোপেশ্বর বুঝতে পারেন না। বলেন, ব্যাপার কি? ও-বাড়ি যাচ্ছে আজ নতুন নয়। আমাদের জামাই হবার আগে থেকে যাতায়াত।

সে তো সবাই জানে। তাই নিয়ে লোকে হাসাহাসি করে এখনো। খাতির করে ব্রতীন ছোঁড়া বাড়ি ডেকে নিয়ে যেত। ওর সেই ধুমসি বোন মলিনার হাত দিয়ে চা পাঠাত। বোন গছাবার চক্রান্ত। শুধু ব্রতীন কেন, ওর মা-বাপ সবাই তার মধ্যে। কালো মেয়ে বলে শেষ অবধি পেরে ওঠে নি।

গোপেশ্বর বলেন, সেই সময় যখন পারে নি, এখন বিয়েথাওয়ার পরে আবার সে কথা উঠছে কিসে?

জান না তুমি, বিষম ধড়িবাজ হল মলিনাটা। বিয়ে আজও হয় নি। আর আমাদের ইনি হলেন সাক্ষাৎ মনসা ঠাকরুন—ফোঁস করে ফণা তুলেই আছেন। এ সময়টা আবার ঝগড়াঝাঁটি চলছে জামাই-মেয়েয়। আমায় কিছু না জানিয়ে এত বড় কাণ্ড কেন হতে দিলে বল তো?

কী জবাব দেবেন গোপেশ্বর, তাঁর কোন দোষ? জামাই যাচ্ছে

বন্ধুর বাড়ি, হাত ধরে তিনি টেনে ধরবেন নাকি? আবার এক দুর্যোগ—কালবৈশাখীর সময়, বেশ এক চোট ঝড়-জল হয়ে গেল এর মধ্যে। না মেয়ে না জামাই—কোন তরফের দেখা নেই। নির্মলা বাঘের মতন গর্জন করে এঘর-ওঘর করছেন। লাঠি ও টর্চ খুঁজে নিয়ে গোপেশ্বর উঠলেন। ডাক্তারখানায় আজ গেলেন না; বিয়েবাড়ি খোঁজ করে আসা যাক। ধূলগাঁ নদীর ওপারে। খালের বেহদ্দ নদী—শুকনোর সময় এখন পায়ের পাতা ডুবতে পারে বড় জোর।

হেনকালে রাস্তার উপরে ছায়ার মতন দেখা গেল। হাঁ, তিনিই—দুর্গা দেবী। বৃষ্টিতে ভেজা হয়েছে খুব। জুতো ভিজে আমসত্ব, কাপড়চোপড় ভিজেছে। এই অবস্থায় একা একা ফেরা হল এতক্ষণে। নির্মলার রাগ অকারণ নয়।

জুতো খুলে রেখে দুর্গা দালানে ঢুকল। নির্মলা ঘুরে দাঁড়ালেন। বকাঝকা কিছু নয়, মুখই দেখবেন না ও-মেয়ের। বর এসেছে—সে অবস্থায়ও এত দেরি করে আসতে পারে, বকুনি ও শাসনের বাইরে চলে গেছে সে।

মেয়ে চলে গেলে স্বামীকে বললেন, ক'টা বাজে দেখে নাও একবার। বাপসোহাগী কথা দিয়ে গিয়েছিল কিনা বাপের কাছে! বাপ সেই বিশ্বাসে ছেড়েছিলেন।

গোপেশ্বর ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে চান: একটুখানি দেরি করে ফেলেছে। বিয়েবাড়ি থেকে সকলের হাত ছাড়িয়ে আসা—

ন'টা-সাত এখন। এক ঘণ্টার উপর—সাতশট্টি মিনিট। এই হল একটুখানি দেরি?

তবু তো জামায়ের আগে এসে পড়েছে। জামাই কিছু টের পাবে না। তা হলেই হল।

আর খানিকক্ষণ পরে নিরঞ্জন ফিরল। নিজের মেয়ের দিকে মুখ ফেরানো যায়, পরের ছেলের বেলা উল্টো। মেয়ের অবহেলা

মায়েরই পুষিয়ে দিতে হয় খাতিরযত্নে। খাইয়ে-দাইয়ে নির্মলা জামাইকে ঘর অবধি এগিয়ে দিলেন। দেখ কাণ্ড একবার! বিয়ে-বাড়ির ফেরতা মেয়ে আগেভাগে বিছানায় পড়ে পাশবালিশ আঁকড়ে অঘোর ঘুম ঘুমুচ্ছে। তাই দেখ একালের নিষ্ঠা—মানুষ নাকি এরা?

সেকাল যেন পাখনা মেলে উড়ে চলে যায় নির্মলার মনের উপর ছায়া ফেলে। দাবাখেলায় গোপেশ্বর মেতে যেতেন ঠিক এখনকার মতোই। পাড়াগাঁয়ের বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার—বাড়ির সব নিঃসাড় অচেতন। রাত ঝিমঝিম করছে, তক্ষক ডেকে ডেকে উঠছে বোধন-তলার দিক থেকে, ঘর-কানাচে লতাপাতা নড়ছে বাতাসে—মনে হয়, ওদিক বিস্তর লোকের আনাগোনা। আর ঘরের মধ্যে সেদিনের নতুন বউ নির্মলা। সে সব কথা ভাবতে আজও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। মানুষটি কম কষ্ট দিলেন চিরজীবন ধরে! ঘরে বউ একা, আর ওঁরা কিস্তি হাঁকছেন বৈঠকখানায় হ্যারিকেন-আলোয় বসে। শাশুড়ি বার বার এসে বলেছেন, তুমি খেয়ে নাও বউমা—গোপেশ্বরের ভাত ঢাকা থাক। বলছেন, ভয় করে তো আমার ঘরে এসে শোও বউমা।—না মা, ভয় কিসের ঘরের মধ্যে? আমার অত ভয়-টয় নেই। ঘুম পেয়ে গেছে, ঘুমের মধ্যে ওঠাউঠি করতে কষ্ট হয় মা। বলেই হাই তুলে চোখ বুজেছিলেন নির্মলা—সেই কিশোরী নতুন বউ। শাশুড়িও এখনকার মতো বুড়ো-থুত্থুড়ে হাঁপানির রোগি নন, শক্তসমর্থ গিন্নিমানুষ, বৃহৎ সংসারটা যেন মুঠোর মধ্যে ভরে রেখেছিলেন। বউ বুঝিয়ে দিল এমনি করে, আর ওঁরা সেকালের নিপাট ভালমানুষ—তাই বুঝে অমনি চলে গেলেন। কিন্তু ভয় করছিল সত্যি। ভয়ের সঙ্গে মেশানো উৎকণ্ঠা। কখন আসবে তুমি, কত দেরি? এসে খাওয়াদাওয়া শেষ কর না, তারপরে টের পাবে মজাটা। খাওয়ার আগে কিছুতে নয়, সামলে থাকতে হবে—নয় তো উনিই বেঁকে বসবেন,

খোশামুদি করে তখন পার পাওয়া যাবে না। নিঃশব্দে খেয়েদেয়ে পান চিবাতে চিবাতে উনি বলছেন, আর কেন, বসে যাও তুমি এবারে। উঁহু, খাব না বলছি, খিদে নেই আমার—না, না, না, তুমি কি পরখ করবে গো? দেখ, ভাল হবে না কিন্তু।…না, না—কেউ না দেখুক, আমার বুঝি লজ্জাশরম নেই? রাত পুইয়ে যায়, এখন উনি এলেন ইয়ে করতে—সরো, সরো…আহা, খাব এখন, বলছি তো খাব—তুমি শুয়ে পড় আগে। ওদিকে ফের, লেপ মুড়ি দিয়ে পড়। পুরুষের সামনে এই বড় বড় হাঁ করে খাব—লজ্জা করে না বুঝি! আলোর জোর কমিয়ে দিয়ে এদিকে পিছন করে খেতে বসেছিল নির্মলা। সে-কালের সেই ঢলঢলে-মুখ পাতা-কেটে চুল-বাঁধা দত্তবাড়ির ছোটবউ। খাচ্ছে আর মাথা তুলে পিছনে দেখছে এক-একবার। কিছু বিশ্বাস নেই ও-মানুষকে—লেপ ফেলে টিপিটিপি উঠে এল হয়তো। তখন তো পালাতে হবে। উঃ, কম জ্বালাতন করেছেন উনি!

নিশ্বাস পড়ল একটা। হায় রে সেকাল! এরা বড় দুর্ভাগা, মনে রসকস একটু নেই—নতুন কাল সমস্ত শুষে নিয়েছে। ঢাউশ ইংরেজি-বাংলা খবরের কাগজ পড়ে, এদেশ-সেদেশের ভারি ভারি বুলি কপচায়। পাড়াগাঁর মেয়ে দুর্গা—তারই দেখছ এই। আর শহর থেকে দু-একটা মেয়ে-বউ যা আসে, তাদের তো মুখের দিকে তাকানো যায় না। সেকালের টুলো-পণ্ডিতেরা যেমন ছিলেন—এই গ্রামে ছিলেন বলরাম স্মৃতিরত্ন—হাল আমলের মেয়েগুলো দেখ, সবাই যেন বিনুনির মধ্যে স্মৃতিরত্নের সেই লম্বা টিকিটা লুকিয়ে রেখে পাউডারের প্রলেপে স্মৃতিরত্নের ফোঁটা-চন্দন ঢেকে স্মৃতিরত্নের খড়মের আওয়াজের মতোই খুট-খুট জুতো বাজিয়ে চোয়াড়ে মুখ নিয়ে ঘুরেফিরে বেড়ায়।

ওঠ রে—এই দুর্গা, উঠে বালিশ-টালিশ নিয়ে ভাল হয়ে শো।

উঁ!—বলে গড়িয়ে ও-পাশে সরে গেল মেয়ে। এই অবস্থায় ফেলে যাওয়া চলে না। হয়তো বা সমস্ত রাত পড়ে রইল অমনি

বেহুঁশ হয়ে। এমনি তো জামাই রেগে আছে—সে কি আর ডেকেডুকে জাগাতে যাবে? ঘুম অতএব ভাঙ্গ করে ভাঙিয়ে দিয়ে যাওয়া দরকার।

উনি ডাকাডাকি করেছেন তোকে। উঠে আয়।

বাবা ডাকছেন?

হুঁ—

বাপের নামে দুর্গা সঙ্গে সঙ্গে সজাগ হয়েছে। বলে, কেন?

পান দিয়ে এসেছিস?

বড্ড ঘুম ধরেছে। সোনা-মা, লক্ষ্মী-মা, তুমি দাও না দুটো পান সেজে।

বয়ে গেছে আমার। তোর ইচ্ছে থাকে, দিয়ে আয়। নয় তো কী আর হবে! খাবেন না উনি পান। একটা রাত পান না খেলে কেউ মারা যায় না।

এক বেলা ভাত না খেলেও কেউ মারা যায় না—

এবার রেগেছে দুর্গা। রাগে রাগে সে উঠে চলল। বলে, বেশ, তোমার একটা কাজ যদি কখনো করে দিই—বলে দেখো একবার।

মায়ের কণ্ঠ সহসা ছলছলিয়ে ওঠেঃ ক'দিন আর থাকবি! এই তো, এইবারেই নিয়ে যাচ্ছে। ক'টা কাজ আমার করে দিবি তার ভিতরে?

মেয়ের পিছু পিছু নির্মলাও বাইরে এলেন। খানিক দূর গিয়ে বললেন, দাঁড়া। পান আমি দিয়েছি—ঘুমুচ্ছেন উনি।

দুর্গা থমকে দাঁড়িয়ে বলে, তবে কাঁচা-ঘুমে আমায় ডেকে তুললে কেন?

অত্যন্ত কোমল সুরে চাপা গলায় নির্মলা বললেন, ক'টা কথা তোকে বলে দেব। যা বলি শোন, অবাধ্য হোস নে। সন্ধ্যেরাতে অত ঘুম কেন রে? বেশি ঘুম ভাল নয়, শরীর খারাপ করে।

দুর্গা ফোঁস করে ওঠে : সন্ধ্যে বলছ এখনো মা? রাত ভোর হয়ে গেলেও তোমার সন্ধ্যে শেষ হবে না।

সে দোষ তোরই। নিজে কখন ফিরেছিস, সে খেয়াল আছে? যাক গে। সতী নারীর ইষ্টদেবতা হলেন পতি। ঝগড়াঝাঁটি না হয় যেন নিরঞ্জনের সঙ্গে।

ভালমানুষের মতো দুর্গা বলে, না মা, ঝগড়া করতে যাব কেন?

মুখ গোমড়া করে থাকবি নে মোটে। ভাল ভাল কথা বলবি। পুরুষমানুষের মন তপস্যা করে পেতে হয়।

বুঝতে পেরেছি। তাড়াতাড়ি শেষ কর মা, আর পারছি নে। কালকে ভাল করে শুনব।

সকালে ওঠবার সময় পা ছুঁয়ে প্রণাম করে আসবি কিন্তু।

ঘাড় বেঁকিয়ে সকৌতুকে দুর্গা বলে, কেন?

ঘুমের ঘোরে পা-টা যদি গায়ে লেগে যায়। গুরুজন তো! ঘুম ভাঙার পর প্রণাম করে পাপ খণ্ডে আসতে হয়।

দুর্গা বলে, শোবই না তা হলে খাটের উপর। নিচে মাদুর পেতে শোব। তা হলে গায়ে পা লাগবে না।

নির্মলা ক্রোধে ফেটে পড়েন : লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে, এতক্ষণে তুই এই বুঝলি?

দুর্গা ইতিমধ্যে পাখির মতো যেন উড়ে পালিয়ে গেছে। দড়াম করে ঘরের খিল এঁটে দিল। আর কি করবেন নির্মলা—দাঁড়িয়ে রইলেন হতভম্বের মতো।

রাত্রু অনেক হয়ে গেল রান্নাঘরের পাট সারতে। নতুন জামাই বাড়িতে, সেজন্য তরকারি দু-পাঁচটা বেশি হবেই। তার উপর বাড়ি ফিরতে ওরা অত দেরি করে ফেলল। মেয়ের কাছে নির্মলা সন্ধ্যেরাত বলুন আর যা-ই বলুন, রাত দুপুর তো তখনই। রান্নাঘর সেরে

দরজায় শিকল তুলে দিয়ে দাওয়ায় পা ঠেকিয়েছেন—পাশে ধানের গোলা—ঝুরঝুর করে যেন কি পড়বার আওয়াজ গোলার নিচে। চোর-টোর নাকি? গোলার তলদেশে আগর দিয়ে ছেঁদা করে ছিদ্র-মুখে বস্তা পেতে ধান পাচারের এক কায়দা আছে—তেমনি কিছু? কিন্তু উঁচু পাঁচিল টপকে চোর বাড়ির মধ্যে আসে কেমন করে?

চুপচাপ গোলার দিকে সতর্ক ভাবে তাকিয়ে রইলেন। ও হরি, চোর নয়—ইঁদুর। গোলার ভিটেয় ইঁদুরে গর্ত খুঁড়ছে, তারই মাটি পড়ছে নিচেয়। পায়ের শব্দ করে সেদিকে গেলেন তো সঙ্গে সঙ্গে মাটি পড়া বন্ধ। সরে এলে খানিকটা পরে আবার শুরু হবে। ইঁদুর অতিষ্ঠ করে তুলেছে। গোবর-মাটি লেপে লেপে পারা যায় না। গর্ত ভরাট করে দিব্যি লেপে-পুঁছে দেওয়া হল, কাল সকালে দেখতে পাবে আবার নতুন গর্ত। গোপেশ্বরকে বলতে হবে গোলার ভিটে ইটে গেঁথে পাকা করে দেবার জন্য। তা হলে আর ঝঞ্ঝাট হবে না।

নজর পড়ল, খিড়কির দরজা খোলা। কী আশ্চর্য, নিজ হাতে নির্মলা সন্ধ্যার সময় হুড়কো বন্ধ করেছিলেন, খুলল কে? খিড়কির পথ পুকুরের পাড় ধরে আমবাগান আর বাঁশবনের ভিতর দিয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। আয়েসা বউ এলো ঐ পথে বর দেখতে। তখন কোথায় বা বর, কোথায় বা কনে—দু-জনে দু-দিকে টহল দিতে বেরিয়েছেন। এসেই তক্ষুণি চলে গেল। জামাইকে কাল বাড়িতে নিয়ে চাট্টি খাওয়াতে চায়; নির্মলা ওদের বাড়ি গিয়ে রেঁধেবেড়ে দেবেন। এই ক'টা কথা বলে ধূল-পায়ে আয়েসা বউ চলে গেল। পিছু পিছু গিয়ে নির্মলা দুয়োর বন্ধ করে এলেন। রাত্রে তার পরে কারা এলো এ-বাড়িতে?

আর, এসেছিল আখেজ গোলদারের মাহিন্দার। সে তো সদরের পথে—সামনের দিক দিয়ে। এক ভেটকিমাছ দড়াম করে রান্নাঘরের দাওয়ায় এনে ফেলল। আখেজ হলেন গ্রামের তালুকদার, ভিন্ন পাড়ার

বাসিন্দা। দীঘির মতো বিশাল পুকুর আছে, বিস্তর বড় বড় মাছ। জামাই আসছে বলে আখেজেরই প্রস্তাব মতো দড়াজাল নামান হয়েছিল সকালবেলা সেই পুকুরে। কিন্তু একটা মাছ পড়ল না—জলের নিচে পাটা-শেওলা, শেওলার উপর দিয়ে জাল গড়িয়ে আসে। তারপর অবশ্য গোপেশ্বরের খিড়কি-পুকুর থেকেই মাছের ব্যবস্থা হয়েছে। তবে পটকা মাছ, আকারে ছোট। নিজের পুকুরে বেকুব হওয়ার দরুন আখেজের মনে লেগেছে। এর জন্যে মাথা যেন হেঁট হয়ে গেছে—বিশেষ করে হিন্দুদের মধ্যে। আলোচনা করছে তারা এই নিয়ে, হয়তো বা হাসাহাসি করছে। হাটের মাছ কিনে মাহিন্দার দিয়ে তাই পাঠিয়ে দিলেন। গোপেশ্বরই বা কম যান কিসে? পয়সা দিয়ে কেনা মাছ কেন মাংনা দিতে যাবেন তিনি? জবেদ মিঞার মতো মানুষ হলেও কথা ছিল, জবেদের সাদা মন। আখেজ তালুকদার মানুষ—টাকা আছে সেইটে জানান দেবার জন্য হাটের সব চেয়ে বড় ভেটকি-মাছ কিনে পাঠালেন। দাম কত নিয়েছে মাহিন্দার কিছুতে বলল না। আখেজ নিশ্চয় মানা করে দিয়েছেন। কিন্তু হাটের জিনিস যখন, দাম বেরিয়ে পড়বে কারো না কারো মুখ থেকে। কোন এক অজুহাতে গোপেশ্বর দাম শোধ দিয়ে দেবেন, আখেজের কাছে ঋণী হয়ে রইবেন না। মরে গেলেও না।

দরজা ফের বন্ধ করে নির্মলা ফিরছেন, অদূরে লিচুতলার দিকে নজর পড়ে। ডাল-পাতার ফাঁকে ফাঁকে মেঘ-ভরা ঘোলাটে জ্যোৎস্না—উঁহু, জ্যোৎস্না হবে কেন, মানুষ। মানুষই বটে, জ্যোৎস্না অমনধারা নড়ে বেড়াবে না। গা শিরশির করে নির্মলার—চোরের কথা ভাবছিলেন, খোলা দরজা দিয়ে সত্যি সত্যি চোরই ঢুকে পড়ল নাকি? আসছে তো ইদিকেই। আরে, আয়েসা না? রাত দুপুরে একা একা আয়েসা বউ—কি রে, ব্যাপার কি?

আয়েসা বলে, চাঁদনি রাত, এ-বাড়ি আর ও-বাড়ি—আমি অমন

ভয়ত্তরাসে নই দিদি। হুগ্গার সঙ্গে তর্কাতর্কি হয়—ওর মুখের কাছে কেউ তো দাঁড়াতে পারে না—হুগ্গা বলে, আচ্ছা, পাতান দিয়ে শুনে এসো কী আমাদের মধ্যে বলাবলি হয়। খিড়কির দুয়োর ও-ই খুলে রেখেছিল। বাড়ির মানুষ ঘুমিয়ে পড়লে টুক করে আমি চলে এসেছি। যাচ্ছি এইবারে।

নির্মলা বললেন, লিচুতলা থেকে কি পাতান দিলে? গলা ফাটিয়ে না বললে এক কথাও তো শুনতে পাবে না এতদূর থেকে।

আয়েসা বলল, কি করব, ওইদিকটা যেতে পারি না যে!

নির্মলা মুখ তুলে তাকালেন। ফিসফিস করে কৌতুক-কণ্ঠে আয়েসা বলে, বাঘ ওদিকে। কেমন করে যাই দিদি? গেলে কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খাবেন।

আঙুল দিয়ে দেখাল। সেটা হল পূবের দালানের রোয়াক। পাতান দেবার আহা-মরি জায়গা বটে! সিমেন্টের রোয়াকের উপরে দিব্যি জুত করে বসে জানলায় কান পেতে বসে থাক গে। যতক্ষণ ইচ্ছা থাক বসে। তা নয়—এত বৃষ্টিবাদলার পর লিচুতলায় জলকাদার মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বউটা।

রোয়াকের দিকে চললেন নির্মলা। বাঘ এসে পাতান দিচ্ছে, আয়েসাকে কাছে পেলে চিবিয়ে খাবে—দেখে আসা যাক এ হেন বস্তুটা। রোয়াকের উপর কেউ নয়—থাকবার উপায়ও নেই। সন্ধ্যাবেলা পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেটা জ্বলছে এখনো। খোলা জানলা হা-হা করছে—জানলা দিয়ে আলো এসে পড়ে দিনমানের মতো হয়ে গেছে জায়গাটা। যুগলে কথাবার্তা হচ্ছে—আস্তে নয়, রীতিমত শব্দসাড়া করে। ঝগড়াঝাঁটি নয় সেটা ঠিক, তবু যে কী ব্যাপার ঠিক মতো বোঝা যাচ্ছে না। আর খানিকটা এগিয়ে যাবেন—কিন্তু সাহস হয় না ওই খোলা জানলা ও জোরালো আলোর মুখে।

রোয়াকে নয়, রোয়াক থেকে পৈঠা নেমে গেছে—পৈঠার পাশে গুঁটিশুটি হয়ে মানুষ। রোয়াকের সঙ্গে মিলিয়ে আছে।

কে ওখানে ?

আমি। চুপ কর বউ, চুপ—

বড়গিন্নি চাপা গলায় নিষেধ করছেন। আয়েসা যাঁকে বাঘ বলছিল। বাঘই বটে! ঐ নোংরা আবর্জনায় গিয়ে বসতে পেরেছেন, অথচ আয়েসা হাত খানেকের দূরবর্তী থাকলেও রক্ষে ছিল না। 'সরে যা' 'সরে যা'—করতেন। শুয়ে পড়ে তো হাঁপানির টান টানেন—বুড়োমানুষ এই রাত্রে উঠে কেমন করে এতদূর চলে এলেন, ঈশ্বর জানেন। আর জানতে পারেন ধনঞ্জয় কবিরাজ যাঁর চিকিৎসাধীনে আছেন তিনি।

সর্বনাশ! কাল সারারাত্তির তোমার কী অবস্থা গেছে মা, ঠাণ্ডার মধ্যে এখন এই আস্তাকুড়ে চলে এসেছ ?

শাসনের ভঙ্গিতে বড়গিন্নি বলেন, চেঁচিও না বউমা। কবিরাজকে কিছু বলতে যাবে না। খবরদার!

নির্মলা বলেন, মা তুমি ছেলেমানুষের বাড়া হয়ে গেলে। বয়স হলে মানুষ আবার শিশু হয়ে যায়—তুমি তাই।

আর তুমি ? আমার কি—নাতনি-নাতজামাইয়ের রঙ্গরস পাতান দিয়ে শুনছি, আমি তা পারি, আমার সঙ্গে সম্পর্ক তাই। মা হয়ে তুমি কোন আক্কেলে পাতান দিতে এসেছ, জিজ্ঞাসা করি। কবিরাজের কানে গেলে আমায় বকাবকি করবে। তা হলেও বুঝবে, মানুষটা আজ আছে কাল নেই—নাতনির সুখশান্তি একটুখানি কানে শুনতে বাইরে গিয়ে বসেছিল। কিন্তু গর্ভধারিণী মায়ের কাণ্ড শুনে পড়শিরা কি বলবে, সে কথা ভেবে দেখ বউমা।

জবাব পেয়ে নির্মলা সভয়ে সরে পড়লেন। কিন্তু ঘরে থাকবার জো আছে ? শুয়ে পড়ে উসখুস করলেন খানিকক্ষণ। রোয়াকের

ও-দিকটা কেবল নয়, উল্টো দিকেও জানলা আছে। পিচুতলার দিকে। গাঢ় ঘুম গোপেশ্বরের। নির্মলা ঝুঁকে পড়ে তাঁর গা ঝাঁকাচ্ছেন: শুনছ গো? শোন, কি কাণ্ড করছে তোমার মেয়ে।

ভয় পেয়ে গোপেশ্বর চোখ মেললেন: কি?

হি-হি করে হেসে ওঠেন নির্মলা: আলো জ্বেলে হাত-মুখ নেড়ে বক্তৃতা করছে তোমার মেয়ে। ওমা, কী বেহায়া! দেশোদ্ধার নিয়ে মাঠে-ঘাটে যেমনধারা বক্তৃতা হয়, ঘরের মধ্যে ওরা তাই লাগিয়েছে। দূর থেকে মেয়ের হাত নাড়া দেখে এলাম। বক্তৃতার কথাও একটা-দুটো কানে গেল।

আবার বলেন, আমাদের আমলে ছিল ঘরে পা দিয়েই আলো নেবানো, দুয়োর জানলা এঁটেসেঁটে দেওয়া। তাতে দম আটকে মরে গেলেও উপায় নেই। ফিসফাস করে কথা—ঠোঁট দিয়ে বেরুতে চাইত না। এখনকার এরা লাজলজ্জা পুড়িয়ে খেয়েছে একেবারে।

নির্মলার আহ্লাদ উপছে পড়ছে। মেয়ে-জামাইতে ভাব হয়ে গেছে, এত কথা নইলে আসত না। মেয়ের বাপকে চোখে না দেখিয়ে সোয়াস্তি পান না। হাত ধরে টেনে বলেন, এস না—

গোপেশ্বর জিভ কাটেন: বল কি! তুমি মেয়েলোক, তোমার যা-হোক তবু সাজে। বাপ হয়ে কান পেতে জামাই-মেয়ের কথা শুনছি, লোকে দেখলে আমায় বলবে কি?

বাজে অজুহাত শুনব না। রাত্তিরবেলা কে দেখছে এখন? চল তুমি।

গোপেশ্বর বলেন, দেখবে ওরাই। ঐ যা বললে—জানলা খোলা, আলো জ্বলছে।

নির্মলা অধীর হয়ে বলেন, আলোর দিকে যাচ্ছি নে আমরা। যাবার জো নেই। রোয়াকের নিচে জুজুবুড়ি হয়ে মা বসে আছেন। হ্যাঁ গো হ্যাঁ—হাঁপানি আরোগ্য হয়েছে, চুপিসাড়ে গিয়ে পাতান দিচ্ছেন।

ঠাকুরপো বলে তাঁর আটকায় না, আমি ওদিকে গেলেই হাতে-নাতে অমনি ধরিয়ে দেবেন। কানাচে বাগানের ধারে দাঁড়িয়ে একটুখানি শুনেই আমরা চলে আসব। অন্ধকার ওখানটা, একলা যেতে ভয় করে। সেইজন্যে টানছি তোমায়। শখ করে শোনা তো নয়। জামাইয়ের মেজাজ তিরিক্ষি, আর মেয়েটার মাথা খারাপ—অঘটন কিছু ঘটলে আমাদেরই সামাল দিতে হবে তো!

বিরোধ অন্তে সন্ধির কি কথাবার্তা হচ্ছে, ভাল করে শুনে নিয়ে নির্মলা নির্ভাবনা হতে চান। ঠেকানো যাবে না তাঁকে, ঠেকাতে গেলে অনর্থ ঘটবে। ইচ্ছা না থাকলেও গোপেশ্বরের যেতে হল তাঁর সঙ্গে। যেতে যেতে তবু একবার বলেন, দেখ, উড়োকাল—সাপখোপ থাকতে পারে জঙ্গলের মধ্যে।

তা-ও নির্মলা ভেবে দেখেছেন: লিচুগাছ কাত হয়ে আছে, তার উপর দাঁড়িয়ে শুনব। পাতার মধ্যে ঢাকা থাকব, আমাদের কেউ দেখতে পাবে না। দোডালার উপর বসাও চলবে।

কী দুর্ভোগ সে রাত্রে! বৃষ্টিটা ধরে গিয়েছিল, আবার টিপটিপানি শুরু হল। লিচু-গাছতলায় প্যাচপেচে কাদা, পা বসে যায়। বৃষ্টির জলে গাছও পিছল হয়ে গেছে। গোপেশ্বর বিস্তর কষ্টে দোডালায় উঠে পা ঝুলিয়ে বসেছেন। পায়ের ঠিক নিচে নির্মলা। ঝোপজঙ্গল বলে এদিককার জানলা বড় খোলা হয় না। বন্ধ জানলার উপর নির্মলা কান পেতেছেন। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। কবাটের কাঠের কোণে চোখ রেখে দেখবারও চেষ্টা করছেন। দেখবেন কি ছাই? নিশিরাত্রে কনকনে বাদলার হাওয়া বইছে—কোথায় তোরা চাদর জড়িয়ে গায়ে গায়ে শুয়ে গুনগুন করে কানের কাছে ভালবাসার বচন ছাড়বি, তা নয়—বসেছে দু-জনে দুই চেয়ারে, মাঝখানে এক গাঁয়ের ব্যবধান। যেন দুই বুনো মোষ শিং উঁচিয়ে আছে, কায়দা বুঝলেই তেড়ে গিয়ে পড়বে। হচ্ছে হিন্দু-মুসলমানের কথা। তার অর্থ হল,

জামাই-মেয়ে উভয়েই মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়ে। বোধ করি দু-চার লাইন মুখস্থও রাখে তাক বুঝে ঝাড়বার জন্য। বাবাজী তর্ক লাগিয়েছেন : মুসলমানের নজরটা বাইরের দিকে। দুনিয়ার যেখানে যত মুসলমান, সকলকে নিয়ে একজাত গড়বে। নিজের দেশ চুলোয় যাক, সেটা নিয়ে ওদের মাথাব্যথা নয়।

দুর্গা মুসলমানের পক্ষে : আঙুরফল টক। বাইরে কোথাও যে আমাদের হিন্দু-ঘাঁটি নেই! থাকলে আমরাও তাকাতাম সেই দিকে। বাইরে না পেয়ে অগত্যা দেশের মধ্যে যেখানে যত হিন্দু, সবাইকে নিয়ে মিলেমিশে একজাত হতে চাই। বুঝেসমঝে মুসলমানও বেঁকে দাঁড়াচ্ছে উল্টোদিকে।

গোপেশ্বর আগুন। ঝুঁকে পড়ে তিনি স্ত্রীর মাথার কাপড় ধরে টান দিলেন। নির্মলা তাকালেন উপরমুখো। ডালপালার মধ্যে মুখ দেখা যায় না, কিন্তু কি তিনি বলতে চান বোঝা যাচ্ছে। নতুন বিয়ের বর-বউ রাত দুপুরে এখন জাতিতত্ত্বে মেতেছে। বাক্যের খই ফুটছে কন্যার মুখে, দুর্ভাগা ভারতবর্ষের জন্য দুশ্চিন্তার অবধি নেই। আর অনেক—অনেক দিন—বাইশ-চব্বিশ বছর আগে ঐ কন্যার মা, তিনিও আর এক নববধূ তখন, তাঁকে কথা বলাবার জন্য সেকালের এক বরের কতরকম সাধ্য-সাধনা! ওই যে নিচের ডালে বসে-থাকা আজকের প্রৌঢ়া নির্মলা। বিয়ের পর বর গিয়েছিল শ্বশুরবাড়ি, এই যেমন দুর্গার এসেছে। সেই বর-বউয়ের কথাবার্তা : বুঝেছি, বুঝেছি গো বুঝেছি, আমায় পছন্দ নয় কিনা, ঘেন্না করে তাই কথা বলা হচ্ছে না! কাল সকালেই বেরিয়ে পড়ি—কী আর করব—কেউ যখন চায় না আমায়। ভীতু বউ তাড়াতাড়ি কানের একেবারে উপরে মুখ নিয়ে এসে বলে, আঃ, শুনছে যে ওরা! এখন নয়, চুপ করে থাক, তোমার পায়ে পড়ি—

ভোর হবার মুখে, বাড়ির বজ্জাত মেয়ে-বউগুলোর সুপ্তির সম্পর্কে

যখন কিছুমাত্র সন্দেহ নেই, সেই তখনই কথাবার্তায় শুভলগ্ন। এক লহমার মধ্যে অমৃতের পাত্রে তাড়াতাড়ি চুমুক দিয়ে বাড়ির লোকজন জেগে উঠবার আগে পুনশ্চ নিরীহ মানুষ হয়ে অঘোর ঘুম ঘুমিয়ে পড়া। আর এরা দেখ, কলকাতা-শহরের মনুমেন্টের পাদদেশ বানিয়ে তুলেছে, যার খুশি জমায়েত হয়ে নিখরচায় জ্ঞান-মুক্তা কুড়িয়ে নিতে পারে।

চুপ, চুপ—নিরঞ্জন বাবাজির প্রশ্ন এবারে। পাগল বা ক্ষ্যাপা? —কথা বলার ঢংটা একবার শোন: বক্তব্য আপনি সোজা করে বলুন। হিন্দু একজাত হচ্ছে—তার মানে বোধ হয় অস্পৃশ্যতা-লোপের কথা বলতে চাচ্ছেন। এটাও অপরাধ নাকি হিন্দুর পক্ষে?

শ্রীমতী দুর্গা দেবী জবাব দিচ্ছেন, একটা-দুটো জিনিস ভেবে বলি নি আমি। অপরাধ আমাদের অনেক। ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করে দেখতে হবে। শুধু শুধু একপক্ষের উপর দোষ চাপিয়ে কোনদিন সমস্যার সমাধান হবে না। আজকে যদি দেশের সমস্ত মানুষ এক হয়ে দাঁড়াতে পারতাম, কী কাণ্ডটা হত ভাবুন দিকি...

হত কচুপোড়া! স্রেফ কাগজের বুকনি। সকালবেলা খবরগুলো পড়ে আবার দুপুরে হাই তুলতে তুলতে সম্পাদকীয় পাতায় ঠিক এইগুলোই পড়ি থাকি। রাত পৌনে-একটায় বুকনি শোনবার জন্ম লিচুগাছে চড়ে বসি নি রে বাপু। আরও অসহ্য, একফোঁটা মেয়েকে 'আপনি' 'আজ্ঞে' করে বলছে। এই সব করেই মাথাটা খেয়ে দিচ্ছে দুর্গার। তিনটে পাশ-করা ভাল ছেলে সম্ভ্রম করে কথা বলছে, মেয়ে ভাবছে রাতারাতি লাটবেলাট হয়ে পড়েছে বুঝি! তা হলে আর মানবে কেন, হেনস্থা করবেই তো বরকে। পুরুষসিংহ দুর্লভ আজকালকার দিনে, সমস্ত কাপুরুষ।

এমন সময় আর এক বিপদ। ভিতর থেকে খট করে এদিককার জানলার ছিটকিনি খুলে ফেলল। জ্ঞানগর্ভ জাতি-সমস্যা লিচুবাগানের

মধ্যে যাতে অবাধে প্রচার হয়, হয়তো বা সেই উদ্দেশ্য। কিন্তু অব্যবহারের দরুন কবজা জাম হয়ে গেছে, ঝাঁকাঝাঁকিতে খুলছে না। খুলে গেলে তো সর্বনাশ—লিচুগাছ আলোকিত হবে, এবং বৃক্ষারূঢ় শ্বশুর-শাশুড়ি নজরে এসে যাবেন। কী করা যায় তবে? লাফ দেবেন ডাল থেকে, এবং মাটিতে পড়েই দৌড়? কিন্তু 'চোর' 'চোর'—চেঁচিয়ে ওঠে ওরা যদি? বাঁশবনটা ছাড়িয়েই জবেদের বাড়ি। এদিকে-ওদিকে আরও সব আছে। শুনে সকলে যদি রে-রে করে লাঠিসোটা নিয়ে এসে পড়ে? সদরে আর খিড়কিতে গাঁয়ের মানুষ এসে জমায়েত হয়?

ঠেকিয়ে দিল দুর্গা। নিরঞ্জনকে বলে, জানলা খোলেন কেন? ওদিকটা জঙ্গল আর পগার। লিচু-ডালে ছিনেজোঁক কিলবিল করছে, জানলা খুলবেন না, ঘরের ভিতর জোঁক এসে ছেঁকে ধরবে।

বলে কি! জোঁকের কথাটা খেয়াল হয় নি তো! জোঁকের ভয় নির্মলার কাছে বাঘের ভয়ের চেয়ে বেশি। যেই মাত্র শোনা, অন্ধকারে মনে হতে লাগল কুটকুট করছে যেন পায়ের পাতার উপরে। হাত বুলিয়ে দেখেন, না, জোঁক নয়—কিছুই নয়, এমনি একটু চুলকাচ্ছে। কিন্তু ওই যে ভয় ঢুকে গেল—কেবলই মনে হচ্ছে, কুটকুট করছে সর্বাঙ্গে, আষ্টেপিষ্টে জোঁক এঁটে গেছে। কি করে যে নামলেন গাছ থেকে, ঘরে ঢুকে পড়লেন ছুটতে ছুটতে—কোন-কিছু সজ্ঞানে করেছেন বলে মনে হয় না। ঘরে এসে খোঁজাখুঁজি করছেন জোঁক লেগেছে দেহের কোথায় কোথায়।

গোপেশ্বরও চলে এসেছেন। তিনি বলেন, বোশেখ মাসে জোঁক কোথা এখন? এইটুকু বৃষ্টিতে জোঁক বেরুবে? তুমি পাগল—

তবে দুর্গা ও-কথা বলে কেন? নির্মলা ভ্রূ-কুঁচকে ভাবলেন। ভারি শয়তান মেয়ে, কেমন করে টের পেয়েছে! মা-বাবা দালানের কানাচে এসে দাঁড়িয়েছে, টের পেয়ে গেছে দুর্গা। জোঁকের নামে ছিটকে পড়ি, ওই বলে আমায় জব্দ করল।

কথাটা গোপেশ্বরেরও মনে লাগে। মেয়ে জেনে ফেলেছে। খুব সম্ভব জামাইও। কী লজ্জা, কী লজ্জা!

ভাল করে ফরসা হয় নি তখনো। আকাশে পোহাতি-তারা। দরজার বাইরে থেকে ঠকঠক করছে। দুর্গার গলা : কত ঘুমবে ও মা? দুয়োর খোল।

ধড়মড় করে নির্মলা উঠে পড়লেন : হল কি রে? রাত থাকতে উঠে এলি?

বেশ তুমি মা! রাত দুপুরে তখন হল তোমার সন্ধ্যেবেলা। আর বেলা দুপুরে এখন রাত।

অন্যদিন গলা ফাটিয়ে যার ঘুম ভাঙানো যায় না, এই সকালে নিজে থেকে উঠে এসে সে দুয়োর ভাঙছে। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে নির্মলা শঙ্কিত হলেন—শুকনো চেহারা, যেন অসুখে ভুগে উঠেছে।

কি হয়েছে?

ঘুম হল না। একে গরম, তার উপরে ছারপোকা।

ছারপোকা কই এ-বাড়িতে তেমন কোথায়?

দুর্গা রাগ করে বলে, তবে কি মিথ্যে বলছি? দেখ না, এই দেখ, এই। পিলপিল করে লাইনবন্দি গায়ের ওপর উঠছিল।

সত্যি, খুঁড়ে খেয়েছে মেয়েটাকে। মুখের এখানে-ওখানে রক্তের ছোপ লেগেছে যেন। আহা-রে!

মেয়ে বলে, তবু তো খাটে শুই নি মা। মেজেয় মাদুর পেতে নিয়েছিলাম। তারই গতিক দেখ।

মেয়ের চেয়েও আর যে বড় ভাবনা—উদ্বিগ্ন কণ্ঠে নির্মলা তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করেন, আর নিরঞ্জন, সে বুঝি একা ছিল খাটে?

দুর্গা আকাশ থেকে পড়ে : আমি তার কি জানি?

হ্যাকা মেয়ে ! বিয়ের আগে হলে, এবং জামাই ছেলেটা বাড়ির উপর না থাকলে নির্মলা নির্ঘাত চড় কষিয়ে দিতেন এই কথার পর ; জানতে যাবে তুমি কেন—জানবে সৈরভী গোয়ালিনী, জানবে আসকার গাড়োয়ান !

এর উপরে হতভাগা মেয়ে আবার কৈফিয়ৎ দিচ্ছে : গরমে হাঁসফাঁস করতে করতে ভদ্রলোক বাইরে চলে গেলেন। আমি তখন কি করি, রাত্তিরবেলা ঘরের বা'র হতে ভয় করে, আমি আচ্ছা করে খিল এঁটে মাদুর পেতে পড়লাম।

নির্মলা বলেন, ভারি কাজ করেছ !

মুখ কাঁচুমাচু করে নিরীহ ভাবে দুর্গা বলল, কি করব মা ? দুয়োর বন্ধ করে ঘরের ভিতরেই আমার ভয় করছিল। ফরসা হতে তোমার কাছে ছুটে এলাম।

জামাই কোথা গেল, কি করছে, একটুখানি খোঁজখবর নিলে না ? ও-ছেলের মান-ইজ্জত থাকে তো কুলো বাজিয়ে তোমায় বিদেয় করে নতুন বউ ঘরে নিয়ে আসবে।

এত-সব বাজে কথায় সময় নষ্ট না করে রাজনন্দিনী ঝুপ করে মায়ের বিছানায় পড়ল। পড়েই চোখ বুজেছে। ছুটলেন নির্মলা পূবের দালানে। যে মাদুরে শোওয়া হয়েছিল, মেজেয় পড়ে আছে সেটা ; শিয়রের বালিশ পাশে গড়াচ্ছে। নিরঞ্জনকে বেশি খোঁজা-খুঁজি করতে হল না। বারান্দায় ভাঙা ইজি-চেয়ারটায় পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে বেচারি। এক্ষুনি রোদ এসে পড়বে মুখে।

ওঠ বাবা, ঘরে এসে ভাল হয়ে শোও। কামরায় ছারপোকা থাকে তো তোমার শ্বশুরের খাটে শোও গিয়ে।

চোখ মেলে নিরঞ্জন হাসল। কী মিষ্টি হাসি! যাই বল, পেটের মেয়ের চেয়ে পরের ছেলে অনেক ভাল। দেবতার মতো জামাই হয়েছে। মেয়ে দু-চক্ষে দেখতে পারে না—

তবু দেখ, হাসছে কেমনধারা! সাদা-সাদা দাঁতের উজ্জ্বল পবিত্র হাসি।

নির্মলা ডাকছেন, এস বাবা—

ডেকে নিয়ে গোপেশ্বরের বিছানায় শুইয়ে দিলেন।

গভীর ঘুমে মগ্ন দুর্গা। ঘুমের ভিতর থেকেই সমস্ত-কিছু দেখতে পাচ্ছে। কালী গণেশ শিব চতুর্মুখ-ব্রহ্মা যতগুলো পটের ছবি আছে, একে একে সকলকে প্রণাম করে বাবা রওনা হলেন। রোজই যান— আগে ডাক্তারখানায়, সেখান থেকে রোগির বাড়ি। জামাই-মেয়ে জেগে ওঠে চা খাবে, মা পরিপাটি করে গোছাচ্ছেন। কেটলিতে জল অবধি ভরে রেখে দিলেন। কেটলিটা দুর্গা একটু উনুনে বসিয়ে জল গরম করে নেবে। ব্যস, আর কিছু করতে হবে না। গোছগাছ করে সন্তর্পণে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন মা। যাচ্ছেন জবেদের বাড়ি। দুপুরবেলার খানা আজ সেখানে। আয়েসা জামাইকে বাড়িতে নিয়ে খাওয়াতে চায়—জামাইয়ের সুবাদে বাড়িসুদ্ধ সকলে খাবে। মুসলমান-বাড়ি—এই গ্রাম জায়গায় ওদের রাঁধা-ভাত চলবে না। এ ব্যবস্থা আকাশের চাঁদ-সূর্য ওঠার মতো এতকাল সকলে মেনে এসেছে। ইদানীং আবার এই নিয়েও কথা ওঠে। গোপেশ্বরের নিজের আপত্তি নেই। কিন্তু বড়গিন্নির প্রাণটুকু যতদিন ধড়ে আছে, এসব মুখে আনাও চলবে না। নির্মলা রেঁধে-বেড়ে দশজনকে খাওয়ানোর নামে নেচে ওঠেন। এমন সুযোগ ছাড়বেন উনি? বলেও দিয়েছেন কাল আয়েসাকে। তাই চললেন উনি ও-বাড়ির ব্যবস্থায়। জবেদের দলিচঘরে নতুন উনুন খুঁড়ে রেখেছে, পাকশাক সেখানে।

বাবা বেরিয়েছেন, মা-ও সরে যেতে দুর্গা মায়ের খাট থেকে ডাকছে, ও মশায়, মশায় গো, শুনতে পাচ্ছেন?

তারপর বোধ হয় মনে হল, শুধুমাত্র হিন্দু-মুসলমান তত্ত্বই এ-খাট

ও-খাট থেকে দূরে দূরে ভাল মানায়, অন্ত কথাবার্তা জমে না। বড়-গিন্নি দরদালানে। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে রাত বেশি হয়ে যাওয়ায় তারাও কাল দেরি করে শুয়েছে; ঘুমুচ্ছে এখনো বেহুঁশ হয়ে। কোন দিকে পাতান দেবার যখন কেউ নেই, হেন অবস্থায় জাতিসমস্যা একেবারে অনাবশ্যক। উঠে এসে দুর্গা বাপের খাটের একদিকে বসে পড়ল।

শুনতে পেলাম, আবার বিয়ে করা হবে মশায়ের—

নিরঞ্জন বলে, আমায় বলা হচ্ছে?

হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। মা আমায় বকছে, তুই পোড়ারমুখী খাতিরযত্ন করিস নে, কুলোর বাতাস দিয়ে তোকে বিদায় করে আবার বিয়ে করবে।

নিরঞ্জন রেগে ওঠেঃ অন্যায়—মা হলেও বলব, অন্যায় বলেছেন তিনি।

দু-হাতে দুর্গার মুখখানা টেনে বুকের উপর নিয়ে আসে। বলে, শতদল-পদ্ম এই---কোন চোখ দিয়ে দেখেন মা, কোন মুখে বলেন পোড়ারমুখী! আর যা ইচ্ছে বলুন গে, এ মুখের নিন্দে করলে আমার সহ্য হবে না।

গৌরবে আনন্দে দুর্গা ফেটে পড়বে বুঝি। বলে, পদ্ম না ছাই। তার ওপর যা কাণ্ড হয়েছে, আয়নায় দেখে লজ্জায় বাঁচি নে। মা বললেন, আহা-হা, ছারপোকার কামড়ে কী হাল হয়েছে রে। আমি কেঁদে পড়লাম, বাঁচাও মা তোমার ছারপোকা-জামাইয়ের হাত থেকে।

বলেছ ওই? তা হলে, বেশ—

দুর্গা বলে, মুখ অবধি এসে পড়েছিল, বেরোয় নি। অনেক করে সামলে নিয়েছি।—ওকি, মায়ের গলা! সর্বনাশ, মা তবে যান নি জবেদ-চাচার বাড়ি। বাড়িতে এখনো—কী জানি, ঘরের ভিতর ঢুকে পড়েন নি!

তীরের মতো দুর্গা পুনশ্চ মায়ের বিছানায় গিয়ে পড়ল। এবং সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুম। মা বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন বাবার সঙ্গে—বাবাও তবে তো ডাক্তারখানা থেকে ফিরে এসেছেন। মা বললেন, তুমি যে আবার?

যেখানটায় দুর্গা শুয়ে, তারই একটা দেয়ালের ওধারে। মায়ের কথায় বাবা বললেন, কম্পাউণ্ডার একটা কথা বলল। শুনে ব্যস্ত হয়ে খবর নিতে এলাম।

কি শুনলে? রুগির বাড়ি না গিয়ে ছুটে এসেছ, খারাপ কিছু নাকি?

বাবা আমতা-আমতা করেন: হ্যাঁ—তাই বটে। জরুরি কেস আছে, কিন্তু মনের এই অবস্থায় রুগি দেখা ঠিক হবে না বলে চলে এলাম। শোন, জামাই নাকি ডাক্তারখানায় গিয়েছিল কাল রাত্রে। জলকাদায় আছাড় খেয়ে হাঁটুর অনেকটা কেটে গেছে, আমেদ কম্পাউণ্ডার আর্নিকা খাওয়াল, কাটা জায়গা সাফসাফাই করে আইডিন লাগিয়ে দিল।

নির্মলা বলেন, কই, আমাদের কোন-কিছু বল না তো! কাপড়-চোপড়ে কাদা-মাখা ছিল, এসে ছেড়ে ফেলল। তা অত ভন্না খেয়েছে পথের ওপর, জলকাদা তো মাখবেই। কিন্তু পড়ে যাবার কথা কিছু বলে নি।

একটু থেমে বললেন, আছাড় খাওয়া বলতে লজ্জা করেছে, তাই হয়তো বলল না।

গোপেশ্বর কঠিন স্বরে বললেন, সত্যিই লজ্জার ব্যাপার। অবিশ্যি হতে পারে, বিদেশি মানুষ আমেদ—নিরঞ্জনকে সেই একবার বিয়ের সময়টা দেখেছিল, হয়তো চিনতে পারে নি। যে-লোক ডাক্তারখানায় গিয়েছিল সে অন্য কেউ। আমি সেইটে পরখ করতে চলে এলাম। নিরঞ্জন হলে হাঁটুতে কাটা থাকবে। দেখ দিকি, তুমি একটু জিজ্ঞাসা করে দেখ।

নির্মলা রাগ করে ওঠেন ঃ ঘুমুচ্ছে বেচারা—ডেকে তুলে আমি এখন জিজ্ঞাসা করতে যাই ! হাঁটু একটুখানি ছড়ে গিয়ে থাকেই তো উতলা হবার কি আছে ?

গোপেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে বলেন, তবে থাক। ঘুমোক, আর এক সময় দেখা যাবে। মা কালী করুন, নিরঞ্জন যেন না হয়—নিশ্চয় সে অন্য লোক।

নির্মলার বিচলিত কণ্ঠ শোনা গেল ঃ কেন, অমন করে বলছ কেন তুমি ? কি হয়েছে, সমস্ত খুলে বল আমায়।

গোপেশ্বর একটু চুপ করে থাকেন। বলতে বাধছে, বোঝা গেল। একবার কেসে গলা সাফ করে নিয়ে বললেন, একটা মেয়েও ছিল নাকি নিরঞ্জনের সঙ্গে। আমেদ কম্পাউণ্ডার বলল। ডাক্তারখানার পুকুরধারে বটগাছের আড়ালে মেয়েটা দাঁড়িয়ে ছিল। ডাক্তারখানা থেকে নিরঞ্জন বেরিয়ে এলে দু-জনে মেলার দিকে চলে গেল। আমি অবশ্য সামলে নিলাম আমেদের কাছে ঃ জামাই-মেয়ে জোড়ে কাল মেলায় গিয়েছিল। তখন আমেদ বলে, দুর্গা আমায় দেখে এত লজ্জাবতী হয়ে উঠল কেন ? ডাক্তারখানায় ঢুকে সেই তো সব করতে পারত। করেছেও এসব। তুমি আবার ব্রতীনের বোনের কথাটা তুলে ভাবিয়ে দিয়েছ কিনা !

চাপা তর্জন করে উঠলেন, খবর নিয়ে দেখি, আমি ছাড়ব না। তাই যদি হয়, ব্রতীনের বাপ ওই বুড়োটাকে আচ্ছা করে শুনিয়ে দেব। থুবড়ো মেয়ে কোন আক্কেলে রাত্রিবেলা বৃষ্টিবাদলার মধ্যে মেলা দেখতে পাঠায় আমার জামাইয়ের সঙ্গে ?

দুর্গা শুনছে। শুনতে শুনতে পাথর হয়ে গেছে। নিরঞ্জন যায় নি মোটে ব্রতীনদের বাড়ি। ছি-ছি-ছি—নির্দোষী মেয়ে মলিনার উপর বিনা দোষে অপবাদ পড়ছে। মা কিন্তু এত বড় কথার উপরেও রা কাড়লেন না। মৃদুকণ্ঠে বললেন, এদিকে আবার শোন। আয়েসার

ওখানে যাচ্ছিলাম এখন, উত্তরের বাড়ির অন্ন-ঠাকরুন এসে পড়লেন : তোমার জামাই এসেছে, জামাই দেখাও দুগ্গার মা। দুগ্গার সঙ্গে আজ আচ্ছা একচোট ঝগড়া আছে।—খবর পেলে কি করে অন্ন-পিসি, যে আমার জামাই এসেছে ? না, মেলা থেকে ফিরছি, দেখি, কোন-এক ছোকরা তোমার মেয়েকে ডাব কিনে খাওয়াচ্ছে। মানুষজন দেখে দুগ্গা তক্ষুণি বর বগলদাবায় করে মাঠের মধ্যে নেমে পড়ল। যেন ওর বর কেড়ে নিতে যাচ্ছিলাম !

নির্মলা বললেন, আমি আর কিছু ভাঙলাম না ঠাকরুনের কাছে—ওরা ঘুমুচ্ছে, বলে সরিয়ে দিলাম।

গোপেশ্বর বলেন, হতেই পারে না। বাজে কথা।

অন্ন-ঠাকরুন সে মানুষ নন। উনি বাজে কথা বলবেন না।

ছেলেটা কে হতে পারে তবে বল ? যার তার সঙ্গে আমাদের দুর্গা ঘুরে বেড়িয়েছে— দূর !

নির্মলা বলেন, বিয়ের আগে চড়কডাঙার যে ছোঁড়া উড়ো চিঠি লিখেছিল, সে কোনখান থেকে এসে পাছ নিল না তো ? ছেলে-মেয়ে একসঙ্গে পড়তে দেওয়াই ভুল।

তারপর নির্মলা স্বামীকে বোঝাচ্ছেন, চুপচাপ থাক। ঘাঁটাঘাঁটি করলে দুর্গন্ধ ছড়াবে। যা করতে হয়, আমি করব। নিরঞ্জন উঠুক— তার কাছে খোঁজ নিই, সে গিয়েছিল কিনা ডাক্তারখানায়। জামাইয়ের সঙ্গে মেয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যাক, এ জায়গা থেকে তাড়াতাড়ি বিদায় করে দিই। তারপরে খনাকে ডেকে একদিন শুনব, দুর্গাকে নিয়ে কখন সে ধূলগাঁয়ে গিয়েছিল, কতক্ষণ ছিল বিয়েবাড়ি। সমস্ত শুনব ভাল করে।

নির্মলার কথায় আপাতত ঠাণ্ডা হয়ে গোপেশ্বর জরুরি কলে চলে গেলেন। নির্মলাও গেলেন জবেদের বাড়ি। উঁকি দিয়ে দেখল দুর্গা, সত্যি সত্যি গিয়েছেন এবারে।

দুর্গার দু-চোখে জল ভরে এল। মা তুমি এমন ! এমনি ভাব

তোমার মেয়েকে ! চোখের জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে দুর্গার দু-গালে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

দুর্গা শ্বশুরঘর করতে গেল। গ্রাম পাঁচারই। বেন্নী পার হয়ে ক্রোশ আড়াই গিয়ে রেলস্টেশন—রেলগাড়ি চেপে ঘন্টাখানেকের পথ। তখন নির্মলা নিশ্চিন্তে একদিন খনাকে ধরলেন। বিকালবেলা—জবেদ মিঞার দলিচঘরে বাইরের কেউ নেই—শুধু খনা আর আয়েসা। নির্মলা বললেন, সেই যে তোমার মাসতুত বোনের বিয়ে ছিল—হিমি যার নাম।

খনা বলে, সেই দিনই আপনার জামাই এল—কী মুশকিল বলুন দিকি কাকিমা! আমি বিয়েবাড়িতে—নয় তো কত আমোদ-আহ্লাদ হত জামাই নিয়ে। জামাই আর দিন পেল না শ্বশুরবাড়ি আসবার!

হুঁ। পাকা উকিলের মতন ধীরে ধীরে এগুচ্ছেন নির্মলা : দুর্গা ধুলগাঁয়ে গিয়েছিল তোমার সঙ্গে ?

একটু হতভম্বের মতো চেয়ে থেকে খনা তাড়াতাড়ি বলল, যাবে বই কি! তারও নেমন্তন্ন ছিল। হিমি কত করে বলেছিল যাবার জন্য।

ধীর কণ্ঠে দৃঢ়ভাবে নির্মলা বললেন, অমন ভাসা-ভাসা কথা শুনব না। স্পষ্টাস্পষ্টি বল, গিয়েছিল কি না।

হ্যাঁ—

আয়েসা বউ সঙ্গে সঙ্গে খিলখিল করে হেসে ওঠে। বিস্তর কষ্টে চেপেচুপে ছিল, আর পারল না।

নির্মলা বললেন, যায় নি তা আগেই বুঝেছিলাম। অন্ন-পিসি ধার্মিক মানুষ, পাড়ার ঘোঁটে থাকেন না, তিনি খামোখা মিছে কথা বলতে যাবেন কেন ?

আয়েসা বলে, কি বলেছেন তিনি ?

নির্মলা সমস্ত খুলে বললেন, এদের কাছে কিছু লুকোবার নেই।

শুনে খনা বলে, যদি হয়েই থাকে, আপনি অত রেগে যাচ্ছেন কেন কাকিমা ?

রাগব না ? তোমরা ধিঙ্গি হয়ে মুখে চুন-কালি মাখবে, চোখ বুজে চুপ করে থাকব ? অন্ন-পিসিকে বললাম, জামাই আর মেয়ে এক সঙ্গে বেড়াচ্ছিল। অমন মানুষটার কাছে মিছে কথা বলতে হল।

আয়েসা বলে, মিছে আপনি বলেন নি দিদি।

কী বল ! জামাই তো সেই সময়টা ব্রতীনের বাড়ি।

খনা একটু উষ্ণ হয়ে বলে, এই যেমন খোঁজখবর নিচ্ছেন, সে বাড়িতেও জেরা করে খবর নিয়ে আসুন না, কোথায় ছিল আপনার জামাই।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন নির্মলা। একবার খনার মুখে একবার আয়েসার মুখে চেয়ে বললেন, তোমরা সমস্ত জান। খুলে বল। এই সব শুনে মাথায় যেন বজ্রঘাত হয়েছে। ওঁরও কানে গিয়েছিল— রুগির বাড়ি না গিয়ে ছুটতে ছুটতে কী অবস্থায় যে বাড়ি এলেন !

খনা জিভ কাটে ঃ সর্বনাশ, এতদূর গড়িয়েছে ! তবে আর মুখের কথায় কি হবে ? দলিল দেখাই। চিঠিপত্তোর নিয়ে এসো আয়েসা চাচি। জামাইটিও আপনার কম শয়তান ! পড়ে দেখুন, কী সব লেখে।

হাসতে হাসতে আয়েসা গিয়ে এক বোঝা চিঠি এনে দিল। সর্বশেষ চিঠি—আসবার ঠিক আগে নিরঞ্জন যেটা লিখেছিল—গোড়ার সম্বোধনটাই তাতে পুরোপুরি আড়াই লাইন। রকমারি বিশেষণ ঢেলেছে— কোথায় লাগে ওঁদের সেকালের 'প্রাণেশ্বরী' 'প্রাণপ্রতিমা'। লজ্জায় মাথা কাটা যায় নির্মলার—বিশেষ করে এই ছুটো মেয়ের সামনে। চিঠির ওইটুকু ভাঁজ করে দিলেন। কিন্তু চার পৃষ্ঠার প্রায় সবখানেই বিদঘুটে কাণ্ড—কোথায় ভাঁজ করেন, আর কতটুকু বা পড়েন ! বাদ দিয়ে দিয়ে আসল জায়গাটায় এসে পড়া গেল—'কত দিন

তোমায় পাই নি। হৃদয় গোবির মতন তৃষ্ণায় হা-হা করছে। পাষণ্ড আত্মীয়েরা রাত্রেও লুকিয়ে শুনতে আসবে, মনের কথা বলতে দেবে না। বুকে তুলে নিতে দেবে না তোমায়। শেষরাত্রির দিকে দয়া করে যদি রেহাই দেয়! অত দেরি ধৈর্যে সইবে না। ছলছুতোয় তুমি বেরিয়ে পোড়ো, আমিও বেরুব। কোন এক নিভৃতি খুঁজে নিয়ে আমার দুর্গাকে—

আয়েসা এরা তো এক গাজনের সন্ন্যাসী। সমস্ত জানে, অনেক-বার পড়াপড়ি হয়েছে। আবার তবু উঁকি দিচ্ছে চিঠির দিকে। বলে, গোবি কাকে বলে রে খনা?

খনা বলে, আমি মানা করেছিলাম কাকিমা। এ হল গ্রাম জায়গা —কারো না কারো চোখে পড়ে যাবে। তা ওরা কানেই নিল না। হল তাই, কেলেঙ্কারি ঘটল।

নির্মলা বলেন, মেয়ে আমার দজ্জাল—কিন্তু নিরঞ্জনকে যে অতি গোবেচারা ভেবেছিলাম। তার পেটে এত?

খনা হেসে বলে, বুদ্ধি দিয়ে দিয়ে তাকেও দজ্জাল বানিয়েছে কাকিমা।

ক'মাস মোটে বিয়ে হয়েছে—দেখাই বা হল ক'দিন, আর বুদ্ধিই বা দিল কখন?

আয়েসা বলে, বলি তবে শুনুন। টের পেলে তুগ্গা কিন্তু জন্মে আমার মুখ দেখবে না। রোজই চিঠি লেখে আমাদের এই ঘরে বসে, তুগ্গাটাই যত বুদ্ধি বাতলায়। জামাইয়ের চিঠিও আসে এখানে। তাসখেলার কথা বলে—ওটা লোক-দেখানো। আসল হল চিঠি লেখা আর চিঠি পড়া। চিঠিপত্তোর আমার নামে আসে, আমি তুগ্গাকে দিয়ে দিই।

নির্মলা বলেন, আমাদের বাড়ি আসেও তো চিঠি। নিরঞ্জন কলকাতা থেকে লেখে।

সে ভুয়ো চিঠি। তার মধ্যে যত বাজে কথা। খোকা দেয় আপনাদের।

নির্মলা হতাশ কণ্ঠে বলেন, বসে বসে কেবল এত রকমের চিঠিই তো লেখে। পাশের পড়া পড়ে তবে কোন সময়? জামাই পাশ করতে পারবে না। দুর্গাও তাই। ফেল হবে দু-জনাই।

তারপরে দুঃখিত স্বরে বললেন, ওদের ভাব-সাব হয়েছে—এ তো সুখের কথা। বাপ-মা আপন-মানুষেরা তাই চায়। কেন তবে ঢাকাঢাকি করে মন খারাপ করে দেয়?

খনা বলে, লজ্জা। আপনারা চিঠি খুলে খুলে পড়েন, সে ওরা জানে। লুকিয়ে সকলে কথাবার্তা শুনবেন, সেটা ওরা আন্দাজে বুঝেছে। অত তাই সামাল-সামাল। বড্ড লাজুক কিনা—দুর্গা যেমন আপনার জামাইও তেমনি।

দুশ্চিন্তা কেটে গিয়ে নির্মলা খুব হাসতে লাগলেন: কী কাণ্ড! আমাদের সে আমলে সাধাসাধি করে বউয়ের মুখের একটা কথা বের করতে পারত না, ওরা এখন স্বাধীন-ভারত আর হিন্দু-মুসলিম নিয়ে হুল্লোড় বাধায়। ঘরের মধ্যে চলতে গিয়ে আমরা সেকালে হুমড়ি খেয়ে পড়তাম, ওরা এখন ঘর পালিয়ে মেলার ভিতর টহল দিতে বেরোয়—

খনা বলে, লজ্জা কাকিমা, একালের এই লজ্জা—

গুরুজন হলেন নির্মলা—গর্ভধারিণী মা-জননী। কথা ক্ষণে অক্ষণে পড়ে যায়। ঐ যে বললেন—অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল তাঁর কথা। দুর্গা পাশ করে নি। নিরঞ্জনও নয়। পরীক্ষা অবধি পৌঁছুতেই হল না নিরঞ্জনের। পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে বাড়ি এসে বসল। এখন যদি নিরঞ্জনকে কেউ চোখে দেখেন এবং তার উপর দুটো-পাঁচটা কথা

বলেন সেই মানুষের সঙ্গে, গালিগালাজ করবেন আমায়; বলবেন, বানিয়ে বানিয়ে লিখেছ তুমি। নিরঞ্জন হেন মানুষের পক্ষে বউয়ের সঙ্গে এই ধরনের ষড়যন্ত্র করা একেবারেই অসম্ভব।

কপাল আমার! তা ছাড়া আর কি বলি? হক কথা লিখেও মিথ্যুক নাম নিতে হয়। শুরুতে কেমন বেশ তরতরে জীবন—ঠিক যেমনটি হতে হয়। পড়ে আপনাদের সুখ, লিখে আমারও। পাশ করে উকিল হবে নিরঞ্জন, সুসার-পশার হবে। বরের সঙ্গে দুর্গা বাসা করে থাকবে। ঘর-ভরা ছেলেপুলে এবং পরবর্তী কালে নাতি-নাতনি। বয়সের সঙ্গে মোটা হয়ে আপাদমস্তক গয়নাগাঁটি পরে, পাকাচুলের সিঁথিতে সিঁদুর আর হাতের মুঠোয় পানের কৌটা নিয়ে গিন্নিপনা করে বেড়াবে দুর্গা। এমনিই তো হবার কথা—চায় সকলে এই। কিন্তু হাঙ্গামা এসে পড়ল। হাঙ্গামা ঘরের মধ্যে, এবং অঞ্চলটা জুড়ে সকলের মধ্যে। হাঙ্গামায় সব ওলটপালট হয়ে গেল; চারিদিকে ভিন্ন চেহারা। সভ্যভব্য জামা-কাপড় ছিন্নভিন্ন হয়ে যেমন হঠাৎ পাকাটির মতন হাত-পা এবং হাতের কনুয়ে বোঝাখানেক মাদুলি বেরিয়ে পড়ে। জামার নিচের চামড়া ছিঁড়ে গিয়ে যেমন কদর্য হাড়পাঁজরা রক্তমাংস বেরোয়। আরও নিচেয় সভ্যতাসঙ্গত উত্তম উত্তম বচনজাল ভেদ করে মনের জন্তুগুলো বেরিয়ে পড়ে যেমন।

নিরঞ্জনের বাপ হরনাথ সচ্ছল গৃহস্থ। পেশা তেজারতি—জমিজিরেত ও সোনারূপো বন্ধক রেখে টাকা কর্জ দেন। ধানও বাড়ি দিয়ে থাকেন। পৌষমাসে তিন-তিনটে গোলা কড়কড়ে বোঝাই হয়ে যায়। বছর খোরাকির ধান মজুত রেখে বাকিটা বিক্রি করে দেন। আর কতক খাতকের ঘরে বাড়ি হিসেবে চলে যায়—সুদে-আসলে দেড়গুণ হয়ে সামনের মরশুমে গোলায় তুলে দিয়ে যাবে এই কড়ারে।

বেশ চলছিল। তারপরেই নানা রকম বেয়াড়া আইন পাশ হতে লাগল। তেজারতি নিয়ে নানান বায়নাক্কা—লাইসেন্স করতে হবে, খুশি

মতন সুদ নেওয়া চলবে না। বোর্ড বানিয়েছে—সালিশি করে তারা ঋণের কিস্তিবন্দি করে দিয়ে যায়। হরনাথ ঝানু মহাজন, হালফিলের আইনকানুনে কান দিতে চান না। রাগ করে বলেন, কাজ-কারবার তুলে দেব। তুলে দেবার ইচ্ছে অনেক দিন থেকেই, কিন্তু পাড়া-প্রতিবেশী এসে হাত-পা ধরাধরি করে, 'না' বলতে শরমে বাধে। এবারে সুবিধা হল—ঐ বোর্ডের মেম্বারদের দেখিয়ে দেব: আমার কাছে কেন, তোমাদের নতুন বাবাদের ধর, তারা মুশকিল আসান করে দিক।

নাছোড়বান্দা চাষাভুষোরা বলে, আইন তো আমরা করতে যাই নি। আইন হচ্ছে কলকাতা শহরে—সত্তর ক্রোশ দূর এ জায়গা থেকে। আমাদের কোন দোষ বলুন।

কথা সঙ্গত বটে। হরনাথকে নরম হতে হয়। বলেন, যাই বল তোমরা, ঝামেলার মধ্যে আমি যাচ্ছি নে। জমি রেহান রাখব না আর আমি। একেবারে খোস-কবলায় বিক্রি করে দিয়ে যাবে। মুখে কথা থাকবে, অমুক সময়ের মধ্যে ষোলআনা সুদ সহ টাকা পরিশোধ করে সম্পত্তি খালাস করে নিয়ে যাব। মুখের কথার উপরে ভরসা করতে পার তো এসো বাপধনেরা। নইলে নাচার। আইন হয়ে আরও দেখি সুবিধা হল। আগে ছিল হরেক বখেড়া—ডিক্রি কর, বয়নামা-জারি কর, বাঁশ-দখল কর—এখন সম্পত্তি আগে থেকে ঘরে উঠে বসে আছে, ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেবে কিনা সেইমাত্র বিবেচনা।

কলকাতার মেসে থেকে নিরঞ্জন আইন পড়ে। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো সদর থেকে গোমস্তার টেলিগ্রাম এলো: বিষম বিপদ, এক্ষুণি চলে এসো। যে অবস্থায় ছিল, এক-কাপড়ে সে বেরিয়ে পড়ল। বিপদটা কোন ধরনের গোমস্তা কিছু খুলে লেখে নি—ট্রেনের কামরার মধ্যেই এর-ওর আলোচনার মধ্যে সবিস্তারে জানা গেল।

কোন চাষীর এক দোঁকসল জমি হরনাথ বন্ধক রেখেছিলেন। এ ব্যাপার নতুন নয়, বিশ-তিরিশ বছর ধরে কত এমন হয়ে আসছে। চালাকি-তঞ্চকতা বিন্দুমাত্র নেই, খাতকের কাছে বারম্বার তাগাদা দেওয়া হয়েছে। দিয়েওছে সে কিছু কিছু। কিন্তু নিতান্ত যৎসামান্য—আসল পড়ে মরুক, বছরের সুদের টাকাটাও উশুল হয় নি। মিয়াদ শেষ হয়ে গেলে হেন অবস্থায় যা রীতি—জমির উপর আসতে লোকটাকে মানা করে দেওয়া হল। ধানের ফলন অতি চমৎকার—গত আট-দশ বছরের মধ্যে এমনধারা দেখা যায় নি। লোভে পড়ে গেছে তাই চাষী। দল পাকানোর কথা শোনা যাচ্ছে কানাঘুষায়। কিন্তু এসবে কান দিতে গেলে কাজ-কারবার তুলে দিতে হয়। ফলন হয়েছে তো হরনাথের কপালে। লোকজন নিয়ে সমারোহে তিনি ধান কাটতে এসেছেন, ক্ষেতের আ'লের উপর দাঁড়িয়ে থেকে হুকুম-হাকাম দিচ্ছেন। কিন্তু দিনকাল আলাদা। লোকটা মুসলমান হওয়ায় জুত হয়েছে—হিন্দু-মুসলমানের কথা এনে ফেলেছে এর ভিতরে। দেখা গেল, লাঠি-সড়কি নিয়ে পিলপিল করে মানুষজন নেমে আসছে গ্রাম থেকে। চিরকাল ধরে আজ্ঞে-হুজুর করে এসেছে, হঠাৎ এই তাজ্জব কাণ্ড। ধান-কাটা লোকেরা গতিক দেখে কাস্তে ফেলে চোঁচা দৌড়। বুড়া মানুষ হরনাথও পারলে দৌড়তেন। কিন্তু উপায় নেই আর তখন, চারিদিক দিয়ে ঘিরে ফেলেছে। দৌড়তে গিয়ে আ'ল বেধে পড়ে গেলেন তিনি। আর সেই অবস্থায় কিল-চড়-লাথি-ঘুসি বেধড়ক মারছে। রাগ না চণ্ডাল—বুকের উপর চেপে দাঁড়িয়েছে একজন—ধান কেটে কিছু আঁটি বাঁধা হয়েছিল, আঁটি থেকে কাঁচা-ধান ছিঁড়ে হাঁ করিয়ে তাঁর মুখের ভিতর পুরছে। ঠেসে ঠেসে পুরছে। আর বলে, খা—কত ধানের ক্ষিধে, এইবারে খেয়ে খেয়ে পেট ভরতি কর। এরই মধ্যে একজন কে চেঁচিয়ে উঠল, মেরে ফেললি যে! হাতে দড়ি পড়বে সকলের। সম্বিৎ পেয়ে মড়া

ফেলে সকলে দে ছুট। আর পাত্তা নেই। লাস ওখানে পড়ে রইল সন্ধ্যা অবধি, পুলিশ এসে তারপর সদরে চালান দিল। যে ক'টির নাম বেশি চাউর হয়েছে, তারা গা-ঢাকা দিয়েছে। পুলিশ খুঁজে খুঁজে পায় না। যাদের পাওয়া যাচ্ছে, তারা আকাশ থেকে পড়েঃ কই, আমরা কিছু জানি নে তো! সাক্ষিসাবুদেও সেইরকম প্রকাশ পায়। দাওয়াত পেয়ে কেউ কুটম্ববাড়ি গিয়েছিল, কেউ গিয়েছিল কাটাখালিতে হাট করতে, কেউ বা জ্বর-বিকারে ভুগছিল সেদিনটা···

কলকাতা ছেড়ে নিরঞ্জন বাড়ি এসে উঠেছে। দারোগাকে বলে, ওই জ্বর-বিকারের রুগিটাকে টানতে টানতে নিয়ে তুলুন দিকি থানায়। আপনাদের মতে চিকিচ্ছে করুন। সমস্ত বেরিয়ে যাবে।

দারোগা হেসে বলে, পুরানো চিকিচ্ছের দিনকাল নেই এখন। সে সব অচল।

উপযুক্ত ভিজিট পাবেন। আমি কৃপণতা করব না। যাক প্রাণ রোক মান। করে দেখুন না চিকিচ্ছে।

সাহস হয় না মশায়। মানুষ সব এককাট্টা। চাকরি নিয়ে টান পড়ে যাবে শেষটা।

সদরে তুমুল মামলা। ধর্ম দেখছে কেউ কেউ ঃ কী ছিল আগে ঐ হরলাল লোকটার পুঁটির পোঁটা গেলে গেলে এই এত ভূসম্পত্তি। অসৎবৃত্তির পরিণামটা দেখ—মেরে ধানবনে ফেলে রাখল। শেষ সময়টা না শুনল তারকব্রহ্মের নাম, না পেল আপনজনের হাতের এক গণ্ডুষ জল। আবার দরদের মানুষও আছে ঃ ষোলআনা আইনসম্মত ভাবে কবলা-সূত্রে কেনা জমির উপরে উঠতে গিয়ে এই বিপত্তি! বড্ড যে ইংরেজের পিছনে লেগেছিলে—যাবার মুখে তারা আর কিছু করবে না; চুপচাপ মজা দেখছে। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার রটনা চতুর্দিকে—মুসলমানরা ধান লুঠ করেই ছাড়ল না, মানুষটাকে নৃশংসভাবে খুন করেছে।

ঘোটের উপর দুটো দলে গিয়ে দাঁড়াল রীতিমত। যত চাষা-ভুষো—সবই প্রায় মুসলমান—তারা একদিকে। অন্য দলে গৃহস্থ মানুষজন। বাপ-পিতামহ গাঁতিপটি, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নগদ কিছু রেখে গেছেন; পিতৃসম্পত্তি নেড়েচেড়ে বাড়িয়েগুছিয়ে খান এঁরা, এবং আশা রাখেন নাতিপুতিরাও এমনি নেড়েচেড়ে খেয়ে যাবে। কিন্তু ব্যাপার যা দাঁড়াল, যথোচিত প্রতিবিধান না হলে মানসম্ভ্রম নিয়ে বসবাস চলবে না এই তল্লাটে। বাস তুলতে হবে, তা ছাড়া উপায় নেই। এঁরাই সব নিরঞ্জনের পিছনে। অভয় দিচ্ছেন, বুদ্ধি বাতলে দিচ্ছেন নানারকম। ক্ষেপে গিয়ে নিরঞ্জন দু-হাতে খরচ করছে। পিতৃহত্যার শোধ নেবেই।

দুর্গার পরীক্ষার খবর বেরুল। ফেল হয়েছে। কত রকম আশা ছিল—নিরঞ্জন উকিল হয়ে সদরে বসবে; সদরে নতুন কলেজ হয়েছে, দুর্গা সেই কলেজে পড়বে। কিছুই হল না কোন দিকে। কিন্তু উকিল হয়ে না বসুক, সদরের উকিল-পাড়াতেই নিরঞ্জনের আনাগোনা। মাসের বেশিরভাগ দিন থাকে সে সদরে পড়ে। হরনাথের খুনের মামলা ছাড়াও তেজারতি ও সম্পত্তি-ঘটিত মামলা দশ-বিশ নম্বর সর্বদা লেগে আছে। নিজে সে নতুন করে কিছু জড়াবে না, বাপের পরিণাম দেখে শিক্ষা হয়েছে। পুরানো বিবাদ-বিসম্বাদ মিটমাট করে ফেলবে। কিন্তু এক কথায় সেটা হবার নয়। ফৌজদারি দেওয়ানি অনেকগুলো—চুকিয়ে-বুকিয়ে ধুয়েমুছে বেরিয়ে আসতেও ঝামেলা অনেক। ফৌজদারি নয় দিকদারি; আর দেওয়ানি মামলাকে বলে থাকে দেও আনি—ঘর থেকে এনে এনে দিয়ে যাও। সেই ব্যাপার চলছে।

ছেলে হয়েছে দুর্গার। নাড়িতে সর্বক্ষণ জ্বর, পেট ধরে না কিছুতে। বুকের দুধ শুকিয়ে গেছে। সূতিকা রোগ। নিরঞ্জন বাড়ি থাকে না, বাড়ি এসে যখন শোনে হুঁ-হাঁ করে ফের সদরে চলে

যায়। এমনি অবস্থায় পাড়ার গিন্নিবান্নিরা যে রকম বলেন তাই করা হচ্ছে। গলায় ও হাতে এক কাঁড়ি কবচ-মাদুলি। মাম্বারের থান থেকে মাটি পড়ে আনানো হয়েছে—সেই মাটির কৌটা বাচ্চা ও পোয়াতির কপালে। কিছুতে কিছু নয়। শুকিয়ে দুর্গা সলতে হয়ে যাচ্ছে দিনকে-দিন।

খবর শুনে গোপেশ্বর মেয়ে দেখতে পাঁচারই এলেন। বিয়ের সম্বন্ধ করতে নন্দলাল ধরের সঙ্গে প্রথম এসেছিলেন। বেহাই খুন হবার পরে আর একবার আসেন। ডাক্তারের পক্ষে রোগিপত্তর ছেড়ে যখন-তখন আসা চলে না। এবারে দেখছেন—এই বছর দেড়েকের মধ্যে দুর্গা বলে নয়, বাড়ির চেহারাটাই একেবারে ভিন্ন। চণ্ডীমণ্ডপে ওঠা-বসার জায়গা ছিল, এখন কেউ যায় না ওদিকে। যাবার অবস্থা নেই, ভাঙা সিঁড়ির উপর হাঁটুভর উলুঘাস, হেড়াঞ্চির জঙ্গল, জাতসাপ খোলস ফেলে গেছে তক্তাপোষের নিচে। বাড়ির মধ্যে এতগুলো ঘর লোকাভাবে খাঁ-খাঁ করছে, আবর্জনা জমে আছে—বাইরের চণ্ডীমণ্ডপে ঢোকবার গরজই বা কি! কত পায়রা দেখেছিলেন সেবারে—কার্নিশে বসে বকবকম করত, নিকানো উঠানে চক্কোর দিয়ে ধান খুঁটে খুঁটে খেত। এবারে একটা পায়রা নেই। ওরাও যেন অবস্থা বুঝতে পেরেছে।

দুর্গা ম্লান হেসে বলে, সুখের পায়রা বলে যে! যে বাড়িতে সুখ নেই, সেখানে পায়রাও থাকে না।

গোপেশ্বর মেয়ের কথা শুনছেন। কথা নতুন-কিছু নয়, চিঠিপত্রে মোটামুটি সমস্তই জানা। তবু কিন্তু চোখে জল রাখা মুশকিল।

দুর্গা বলে, আত্মীয়পোষ্য কত ছিল এ বাড়িতে! চোখে তো দেখে গেছ বাবা। মানুষজন গিজগিজ করত। কেউ যে তাদের চলে যেতে বলেছে, তা-ও নয়। একজন দু-জন করে আপনা-

আপনি সবাই সরে পড়ল। সন্ধ্যের পর একবড় বাড়িতে গা ছমছম করে।

গোপেশ্বর বলেন, চলে গেছে—ভালই হয়েছে। জমিজমা নিরঞ্জন সবই তো নয়-ছয় করে দিচ্ছে। লোক বেশি থাকলে খরচ চলত কেমন করে? তুইও চল আমার সঙ্গে। নিতে এসেছি।

নিরঞ্জন বাড়িতে ছিল। গোপেশ্বর সদরে চিঠি দিয়েছিলেন, চিঠি পেয়ে সে বাড়ি এসেছে। তাকে বললেন, দুর্গাকে নিয়ে যাব বাবাজী।

নিরঞ্জন বলে, সেইজন্যে এসেছেন বুঝি? একথা তো চিঠিতেও লিখতে পারতেন। দুটো মামলায় সাবকাশ নিয়ে কষ্ট করে আমায় বাড়ি আসতে হত না। ও বুঝি যাওয়ার বায়না ধরেছে—মন টিকছে না সংসারে?

গোপেশ্বর থতমত খেয়ে বলেন, না বাবা, দুর্গা কি বলবে! নিয়ে গিয়ে আমি চিকিচ্ছেপত্তর করব।

নিরঞ্জন ঘাড় নেড়ে বলে, সে কেমন করে হবে? বাবা মারা যাবার পর থেকে মা তো সংসারের হাল ছেড়ে দিয়েছেন। দায়ঝক্কি সমস্ত ওর কাঁধে। চলে গেলে সংসার অচল।

কিন্তু শরীরের এই অবস্থা। তুমি বাড়ি থাক না—ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখবারও কেউ আছে বলে তো মনে হয় না।

নিরঞ্জন বলে, একটু কাহিল হয়ে পড়েছে বটে! প্রসবের পর সকলেরই হয়। তাই বলে হাত-পা ধুয়ে অমনি বুঝি বাপের বাড়ি উঠবে! এখানেও ডাক্তার-কবিরাজ আছে, রোগ হলে এখানকার লোকেও চিকিচ্ছে করে থাকে।

জামাইয়ের কথার ঝাঁজ বুঝে গোপেশ্বর আর উচ্চবাচ্য করলেন না। আড়ালে ডেকে নিয়ে দুর্গা বলে, কাজ নেই বাবা। নিয়ে যাবার কথা তুমি আর মুখে এনো না। আমি যাব না। বলি তবে

শোন। সদরে শুধু মামলার জন্যে পড়ে থাকে না, অন্য নেশায় পড়েছে। লোকে নানান কথা বলে। মেয়ে হয়ে তোমাকে কি বলব —আমি আছি বলে দুটো-চারটে দিন তবু বাড়ি আসে, চলে গেলে আর এমুখো হবে না।

হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল। চোখ মুছিয়ে দিয়ে গোপেশ্বর বলেন, লোকের কথায় কান দিস নে মা। সময় খারাপ পড়লে অতি বড় সুহৃৎও শত্রু হয়ে যায়। ঘর ভাঙাবার জন্যে যত রটনা।

আবার এক সময় নিরঞ্জনকে নিরিবিলি পেয়ে কেশে গলা সাফ করে নিয়ে গোপেশ্বর বললেন, একটা কথা শুনলাম। জমাজমি সমস্ত নাকি তুমি ছেড়ে দিচ্ছ?

নিরঞ্জন ভ্রূকুটি করে: কে বলল?

গোপেশ্বর বলেন, না বাবা, দুর্গা কিছু বলে নি। গোপন ব্যাপার কিছু নয়, সবাই জানে। তোমাদের পাড়া থেকেই শুনলাম।

নিরঞ্জন বলে, ও বলবে না সেটা জানি। বোঝে নাকি কোনও কিছু, তলিয়ে দেখে? তা হলে আর ভাবনা ছিল কি! ওর কথা নয়, আমার মা-জননী আপনাকে কিছু বলল কিনা সেইটে জিজ্ঞাসা করি।

মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে আবার বলে, হাড়বজ্জাত মেয়েমানুষ। চাঁদের নিচে অমনটি আর দেখবেন না। সৎমা তো—আসল মা নয়। খুলেই বলছি আপনাকে। গাঁয়ের মানুষও অনেকে জানে, তাদের কাছে শুনবেন। মাঠ থেকে বাবার মড়া এনে বোধনতলায় নামাল। মা কোথায় ছিলেন—বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মাথা কুটতে লাগলেন। মাথা কোটেন আর কোমর হাতড়ান। আয়রন-চেস্টের চাবি বাবার কোমরে বাঁধা। এত লোকের চোখের উপর দিয়ে বেমালুম চাবিটা সরিয়ে নিলেন, এমনি সাফাই হাত ঠাকরুনের। লাস নিয়ে সদরে চলে গেল। আমি তখন অবধি

কলকাতায়। সিন্দুক ভরত্তি বন্ধকি গয়না, আকবরি মোহরও ছিল খান আষ্টেক। মা সমস্ত সরিয়ে চাবিটা বাবার বালিশের নিচে রেখে দিলেন। ঐখানে ছিল যেন বরাবর। বাড়ি পৌঁছে হাত কামড়ে মরি। আপনার মেয়ে তো তখন বাড়িতে। কিছু করতে পারল ? চোখ তুলে একটিবার তাকিয়ে দেখেছে ?

গোপেশ্বর তাড়াতাড়ি বলেন, বড় ভাল মেয়ে দুর্গা। ঐ সব ফেরেববাজির মধ্যে যেতে চায় না।

তেতো ওষুধ খাওয়ার মতো মুখ বিকৃত করে নিরঞ্জন বলে, সোজা কথায় বলুন যে ন্যাকা। দেখছি তো এদ্দিন ধরে। খাবে আর ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমবে। মনে জিলিপির প্যাঁচ—কে কোন কথা এসে বলল, সেইটে গেরো দিয়ে রাখবে। কিন্তু আমাকে তো দেখতে হবে সব। যত-কিছু জমাজমি—বাবা অন্তে মালিক হলাম আমি আর বৈমাত্রেয় পাঁচ ভাই। বিক্রি করে দিয়ে কিছু যে হাতে-গাঁটে করব সে জো নেই। পাঁচ ভাইয়ের পাঁচটা পয়সা রেখে তবে আমার ভাগের এক পয়সা। চাষাভুষো ইদিকে সমস্ত জোট বেঁধে বসেছে। একটা সাক্ষি দিতে কেউ চায় না, সব মামলা নষ্ট হবার যোগাড়। ওদের ঐ জোটের মধ্যে ফাটল ধরাতে হবে। আমি তাই সাধু-সাচ্চা হয়ে রটিয়ে দিয়েছি, বাবা অন্যায় করে অনেক ভূ-সম্পত্তি নিয়েছেন, উপযুক্ত প্রমাণ দেখালে ছেড়েছুড়ে দেব।

গোপেশ্বর চমকে উঠে বলেন, ওটা কি করলে বাবা ? সবই তা হলে চলে যাবে, এক কাঠাও কেউ ছেড়ে রাখবে বলে মনে হয় না।

যাক তাই, গেলে আমার পক্ষে লোকসান নেই। রহস্যের দৃষ্টিতে চেয়ে নিরঞ্জন মিটিমিটি হাসে : ঐ যে প্রমাণ দেখাবার সর্ত—বুঝলেন না, ওরই মধ্যে মজা। সে প্রমাণ সৎমা-ঠাকরুনের চোখের আড়ালে নগদ তঙ্কায় দিয়ে যায়। সদরে পড়ে থাকি—সেইখানে যাবতীয় কথাবার্তা, আর ডান হাত বাঁ-হাতের ব্যাপার। সেইটে ঢুকল তো

তারা কি বলবে। এই সব ব্যাপারে কষ্ট হয় তার বড্ড। বলে, তোর পায়ে কাদা ছিল কিনা।

তোর পায়েও তো ছিল। তোর আরও বেশি।

আসল কথা কী করে বলে তারা? যে, জাত আলাদা বলে বড়গিন্নি ঘরে ঢুকতে দেন না? ভালবাসে সে ঠাকুরমাকে; সেজন্য নানান কৈফিয়ৎ খোঁজে।

বলে, বড্ড ভুগছে ঠাকু-মা। হাঁপানির কী টান—দম বেরিয়ে যায় ক্ষণে ক্ষণে। সেই মুখে আমরা গিয়ে পড়লাম। আমাকেও কত সময় বকে ওঠে—আমি বুঝি কিনা, তাই কিছু মনে করি নে। বুড়ো-হাবড়া মানুষ—ক-দিন আর বাঁচবেন—তুই কিছু মনে করিস নে ভাই।

জবেদ বলছিল, আমার যে বড় মুশকিল হল। সোনার এক জুড়ি চাই যে আমার। লাঙল করব, গাড়ি করব। এক বলদে কি হবে? তারা তুই আবার মানত কর, তোর মানতের জোর আছে। এঁড়ে-বাছুর হয় যেন পরের বারে। সেটা আমি নিয়ে নেব।

আয়েসা সজোরে ঘাড় নাড়ল: না, বকনা-ই হবে। হুয়ার বাড়ি যাবে। নিজেরটা দেখছ, শ্বশুরবাড়ি আছে বলে হুয়াকে ভুলে গেলে তোমরা সবাই?

কিন্তু হল না কিছুই। মরে গেল বুধি মাস কয়েক পরে। ভাল গরু মাঠে চরতে গেল, ফিরে এসে জাবনায় মুখ দিতে পারে না। পেট ছেড়ে দিয়েছে। পাথরঘাটার বহুদর্শী এক গো-বদ্যি—ক্ষেতে তখন মই দিচ্ছে, ক্ষেত ছেড়ে আসতে পারবে না—হাতে-পায়ে ধরে নগদ ষোলআনা কবুল করে তাকে নিয়ে এল। দেখেশুনে প্রণিধান করে বদ্যি বলে, তিলে হয়েছে। নুন আর সরষে কচি কলাপাতায় বেঁধে খাইয়ে দাও। বার তিন-চার খাওয়াও—পেট ধরে যাবে, গরু চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

ব্যবস্থা দিয়ে গো-বদ্যি টাকাটা গাঁটে গুঁজে ক্ষেতে নিয়ে আবার

মইয়ের উপর চেপে দাঁড়াল। দাঁতে দাঁত লেগে আছে বুঝির। দু-পাটির মধ্যে কাটারি ঢুকিয়ে দাঁত ফাঁক করে ওষুধ খাওয়ায়। কিছুতে কিছু হয় না। বুঝি ঝিম ধরে পড়েছে। ওষুধে হল না তো দৈব-কর্ম। জবেদ দরগায় গিয়ে পড়ে। লাঠির মাথায় পিতলের চাকতি, দুটো চোখ আঁকা তার উপরে—গাজির আশা বলে এই বস্তুকে। ফকির এসে আশা বুলিয়ে গেলেন গরুর পিঠে। কিছুই হল না, মারা গেল বুঝি।

জবেদ বলে, রোগপীড়ে নয়—এ হল বিষ খাওয়ানোর ব্যাপার। কানাই মুচি এই কাজ করেছে। মরা গরুর চামড়া খুলে নিয়ে মুনাফা পিটবে। সেটা হচ্ছে না, মরা গরু আমি মাটিতে পুঁতব।

কি করে কথাটা গিয়েছে বড়গিন্নির কানে। উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে তিনি উঠে পড়লেন। বেরিয়ে এলেন রোয়াকের উপর অন্য কাউকে না দেখে তারাকে বললেন, ডাক জবেদকে—নিয়ে আয় আমার কাছে ডেকে। আমার নাম করে বলবি, মরে যাই নি আমি এখনো। এত আস্পর্ধা! ওটাকে জন্মাতে দেখলাম—দেখি, মুখের সামনে কেমন করে বলে মা ভগবতীকে গোর দেবার কথা।

জবেদ সামনে এলে সুর তেমন চড়া রইল না। বললেন, গরু মাটিতে পুঁতবি কি রে? গরু হলেন দেবতা—তার উপরে আসল মালিক হলাম তো আমরা। ব্রাহ্মণের গরু কবরে দিবি, এত বড় কথা কোন মুখে বেরুল বল দিকি?

বেকুব হয়ে জবেদ বলে, তবে চিতেয় পোড়াই। কানাই মুচি যা ভেবেছে, সেটা হচ্ছে না। ব্যেটার বাড়া-ভাতে ছাই দেব।

সে ভাল। গরু আমাদের যখন, শেষ-কাজ আমাদের মতন হওয়া ঠিক।

নির্মলা এসে পড়েছেন। তিনি বললেন, তোমাদের সমাজে কি বলবে, সেটা ভাবছ? চিতে সাজালে আস্ত রাখবে না তোমায়।

অসহায় ভাবে জবেদ বলে, তাই দেখেন। মুশকিল দুদিকেই। এগুলে জেড়ের ভেড়ে, পেছুলেও তাই।

মরা বুধিকে নিয়ে ভাগাড়ে ফেলল। যেমন বরাবর ফেলে দিয়ে আসে। গরু চিতেয় পোড়ানো কিংবা কবরে পোঁতা কোনটাই চলে না। সমাজের ভাবনা পরে। কাণ্ড দেখে লোকে তো হেসেই খুন হবে, বলবে পাগল হয়ে গেছে জবেদ মিঞা। বড় দুঃখে সে ওই সব আবোল-তাবোল বলছে। সোনাটা বড় হয়ে গেছে। কিন্তু রূপো মায়ের বাঁটে আর মুখ দিতে পারবে না, তাকে বাঁচানো যায় কি করে এখন? তার উপরে মায়ের পেটের ভাই ঐ সোনার অত্যাচার। খইল কুঁড়ো আর ঘাস কুচিয়ে নরম জাবনা করে দিয়েছে—সোনাকে ডবল পরিমাণে দিয়েছে—তবু নিজের গামলার দু-এক গ্রাস খেয়ে সোনা কোঁস-কোঁস করে তেড়ে যায় রূপোর দিকে। শিঙের সূচাল মুখ দেখা দিয়েছে, সেই নতুন অস্ত্র উঁচিয়ে গিয়ে পড়ে। ভীরু রূপো করুণ চোখে একপাশে গিয়ে দাঁড়ায়, সোনা গবগব করে রূপোর ভাগের জাবনা শেষ করছে। শেষ করে ধীরেসুস্থে এবারে নিজের গামলায় মুখ দিল। মা-মরা বোনটা বলে মায়া নেই। জবেদ একদিন দেখতে পেয়ে আচ্ছা রকম পিটুনি দিল। কিন্তু পিটুনিতে কি হবে হিংসুটে ষাঁড়ের?

আরও বড় হয়েছে—রোখ কি এখন সোনার! ডাক শুনে মনে হবে বাঘের হামলা। চার দাঁত ভাঙল, ছাঁট দেবে এইবার। দামড়া-গরু হয়ে স্বভাব নরম হবে, জোয়ালে কাঁধ দিয়ে বজ্জাতি করবে না। জবেদ গোপেশ্বরের কাছে গিয়ে পড়ল: রূপোকে নেবার কথা—তা নিয়ে নেন এবারে ওকে। দাম যা সাব্যস্ত হয়, আমায় অর্ধেক দেন। আর একটা দামড়া কেনার দরকার—এক জোড়া হলে গাড়ি করে ফেলি। গামালে আর ক'টা পয়সা—গাড়ি হলে তখন গুড়-কলাই ধান-পাট হাটবাজারে নিয়ে ফেলব। মোটা

বেচাকেনা, মোটা রোজগার। ক্ষেতের ধান খোলেনে আনব গাড়ি বোঝাই করে। অবরে সবরে ভাড়া ধরব।

গোপেশ্বর টালবাহানা করছেন : নিতেই তো হবে রে। রূপো হল তারার—মা তারাকে দিয়ে দিয়েছেন। গোয়াল নেই, এখন নিয়ে কোথায় রাখি ? ওই এক বকনার জন্যে গোয়াল বাঁধতে যাব নাকি ? মাঘ-ফাগুনে তারার বিয়ে দেব, গরু সে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাবে। সেই সময় নিয়ে নেব। ভালই তো তোর। যত বড় হচ্ছে, দাম বাড়ছে। বেশি টাকা পাবি।

পৌষ মাস। ধানের পালায় চাষীর উঠানে পা ফেলবার জো নেই। কলাই পেকেছে, কলাই তুলে এনে দাওয়ার উপর গাদা করছে। গাছিরা সকাল বিকাল বাঁকে করে ভাঁড় ভাঁড় খেজুর-রস নামিয়ে দেয় বাইনশালে। রস জ্বালানো হচ্ছে—গুড় বানিয়ে কলসি-ভাঁড়ে ঢালছে বাইনের আগুন সকাল থেকে রাত দুপুরের আগে নেবে না। খাটনি খেটে খেটে মরদমানুষ আর মেয়েমানুষে পেরে ওঠে না, তিলেকের জিরান নেই। সময় বুঝে এই শীতকালে দিনমানটাও ছোট হয়ে গেছে ; ফুড়ুৎ করে লহমার মধ্যে পালিয়ে যায়।

এই সময়টা গামালের ভারি জুত। মরদেরা সারা দিনমান মাঠে পড়ে আছে, বাড়ি এসে দুটো ভাত খেয়ে যাবারও ফুরসৎ হয় না—ছোঁড়ারা মাঠে ভাত-ব্যঞ্জন বয়ে দিয়ে আসে। ধান-কলাই-গুড় দেদার যেখানে সেখানে—মাপজোপ করে তুলে-পেড়ে রাখা এখনো হয়ে ওঠে নি। জবেদ গিয়ে ডালা নামালে ঝি-বউ ছেলেপুলে পছন্দমতো এটা-ওটা তুলে নেয়। দাম দেবার ভাবনা কি—পৌষমাসের দিনে ফসলের কোন দাম আছে চাষীর ঘরে ?

গামালে বেরুবার আগে জবেদ জাবনা খাইয়ে গলার দড়ি খুলে দিয়ে যায় সোনা-রূপোর। ফসল উঠে যাওয়ার পরে এখন এড়া-কাল।

হাঙ্গামা নেই, সারাদিন ভাই-বোনে চরে খেয়ে বেড়ায়। রুর খানিকটা বড় হয়েছে, কাজেরও হয়েছে বেশ। সন্ধ্যা হলে গরু তাড়িয়ে এনে গোয়ালে তোলে। কিন্তু ক'দিন সে জ্বরে পড়ে। ডাকহাঁক করতে পারে নি—জবেদ বাড়ি এসে দেখে, সোনা-রূপো কেউ ফেরে নি। হাত-পা ধোওয়ার তর সয় 'না। খুঁজতে বেরুল।

আয়, আয়—সোনা আয়—রূপো আয়—

বাঁশবনে সাপের ভয়। বডড কাটি-ঘা এবারে। বিষ সাহায্য হতে চায় না। গেল-আশ্বিনে পাথরের মতো জোয়ান পুরুষ একজন চোখের উপর ছটফটিয়ে মরে গেল। তবে শীতকাল বলে সাপ মেজাজি হয়ে পড়ে এই সময়টা, নড়ে চড়ে না। কিন্তু একেবারে মুখের সামনে গিয়ে গিয়ে পড়লে কি আর ছোবল দেবে না? তা কাণ্ড দেখ দুই হারামজাদা গরুর—একটু যদি বিবেচনা থাকে! বাঁশবন হল ওদের রাত্রিবেলার বিচরণের জায়গা।

সোনা-আ-আ—রূপো-ও-ও—

আছে ঠিক, একটু আগে ঝাপসা মতন দেখেছে। সোনা বলে ডাকতেই সরে গেল। গভীরে কোন দিকে ঢুকে পড়েছে। একগাছি ঘাস নেই, তবু পাক দিয়ে বেড়ায় এমনি। অবোলা জীব ওরা, অবোধ—এমন জায়গায় ছেড়ে গিয়ে সোয়াস্তি পাওয়া যায় না। আল্লা যা করেন! জবেদও ঢুকে পড়ল বাঁশবনের ভিতর।

একটা ঝাড়ের গোড়ায় বাঁশ-কঞ্চির ভিতর মাথা ঢুকিয়ে সোনাটা দাঁড়িয়ে আছে। নড়চড়া নেই, গরু কে বলবে? মনে হবে এক মাটির ঢিবি। কিম্বা ঝাপসা চাঁদের আলো পড়েছে একফালি। গরু না পেয়ে ফিরে চলে যাও, তারপর দেখবে শয়তানিটা। বেড়ায় ঘিরে লোকে কাঁকুড়-শসা ভুঁইকুমড়োর চারা দিয়েছে, বাঁশবন থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে সোনা সেই বেড়া ভাঙবে। ভাঙার আচ্ছা কায়দা বের করেছে। শিং ঢুকিয়ে উপর দিকে জোরে দিকে চাড় দেয়। বেড়ার চেরা-

বাঁশ উপড়ে আসে। গোড়ার দিকটা তুলে দিয়ে বজ্জাত গরু পিছিয়ে আসবে খানিক, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। বেড়া চুরমার। ঢুকে পড়ে গোগ্রাসে খাচ্ছে। খায় আর এদিক-ওদিক তাকায়। সে যদি দেখ! ঠিক যেন মানুষ-চোর একটি। ক্ষেতের মালিককে দেখতে পেয়েছে তো চোঁচা ছুট। কেমন করে চিনতে পারে, মালিক এই জন—চলনের মধ্যে কর্তৃত্বের দেমাক আর রাগের প্রস্ফুরণে টের পেয়ে যায়। শেষ একটা লম্বা ডগা ছিঁড়ে নিয়ে দৌড়। মুখে ঝোলাতে ঝোলাতে চলল। ধরাও পড়ে কতবার। খোয়াড়ে দিয়েছিল—না খেয়ে আধমরা হয়ে রইল, দু-দিন পরে জবেদ জরিমানা দিয়ে খালাস করে নিয়ে এল।

বাঁশঝাড়ের ফাঁকে ওই যে মাথা গলিয়ে আছে—সুবিধা হল, টিপি-টিপি গিয়ে জবেদ টুক করে শিঙে দড়ি পরিয়েছে। এর পরে সোনা নিপাট ভালমানুষ—কোন কিছুই হয় নি এমনি ভাবে নির্গোলে বেরিয়ে এলো জবেদের পিছু পিছু। গোয়ালে এসে ঠ্যাং মুড়ে শুয়ে পড়ল।

সোনা তো বাড়ি এসে গেল, রূপসীর খবর কি? গরু যে জবাব দিতে পারবে না—নয়তো জিজ্ঞাসা করা যেত, গুণময়ী বোনটিকে কোন বাগানে রেখে এলে? ভায়ের দেখাদেখি রূপো-ঠাকরুনও পাকা বজ্জাত হয়ে উঠেছে। ভাইকে ছাড়িয়ে যায়। উদ্বেগে জবেদ সারা-রাত্রি উঠে উঠে বসেছে। কিসের যেন আওয়াজ—হুড়কোর ধারে রূপো এসে বুঝি উঠোনে ঢুকতে পারছে না। বাইরে এসে দেখে, কিছুই নয়। হয়তো বা শিয়াল এসেছিল, পালিয়ে চলে গেছে। পরের জিনিস পাহারা দেওয়ার এই জ্বালা। রাগ হচ্ছে গোপেশ্বরের উপর—জবেদের অংশের দাম মিটিয়ে রূপোকে নিয়ে গেলেই তো চুকে যায়। তা বাড়িতে নতুন একটু গোয়ালের চাল তুলতে হবে, সেই জন্যে আজ না কাল করছেন হিসাবি ডাক্তারবাবু।

আর, সেই রাত্রে ফিসফাস কথাবার্তা, গোপনে লোক-ডাকাডাকি

চলেছে ওপাড়ায় আখেজ গোলদারের বাড়ি। সদরের পেয়াদা এসেছে, জবেদের বাড়ি শিল হবে। আইনের ভাষায় যার নাম অস্থাবর-ক্রোক। আয়েসার সঙ্গে যেবার বিয়ে হল, জবেদ সুখতে পঞ্চাশ টাকা কর্জ নিয়েছিল আখেজের কাছ থেকে। মুসলমানের পক্ষে সুদ নেওয়া হারামি, আখেজ সুদ নেন না। সাকুল্যে পাঁচ বিঘে জমি জবেদের—তারই মধ্যে বিঘে খানেকের মতো একখানা জমি এই বাবদে সে চিহ্নিত করে দিয়েছে। সেই জমির বর্গাদার জবেদের অংশের যাবতীয় ধান আখেজের খোলাটে তুলে দিয়ে আসে। সেটা হল ধান—টাকা নয়, সুদও নয় অতএব। এমনি চলছে এত দিন ধরে। কিন্তু আজ বছর দুই-তিন এমন অবস্থা, ধানের ভাগের ভাগ পনের-বিশ খুঁচির বেশি হচ্ছে না। নাকি ক্ষেতে ফলন হয় না। তার মানে ত্যাঁদড়ামি—জবেদ বর্গাদারকে তাড়াহুড়ো করে না, সে-লোক অন্য সমস্ত জমিজিরেত তুলে শেষ করে তারপর এই ক্ষেতে নামে। নাবি হয়ে গিয়ে ক্ষেত তখন চেঁচোঘাসে ঢেকে আছে—চেঁচোবন ঠেলে লাঙলের ফলা মাটিতে একটুখানি আঁচড় কেটে যায়। অমন দায়-সারা চাষে ফসল ফলে না। জবেদকে জানানো হয়েছে, তৎসত্ত্বেও সে কোন গরজ দেখায় না। ভাবখানা হচ্ছে: ধান এত কাল প্রাপ্য সুদের অনেক উপর দিয়ে গেছে, হেসে হেসে দিব্যি তো গোলায় তুলেছ, বাড়তি বলে জবেদকে দু-কুনকে দিতে এসো নি। আজকে কম হচ্ছে বলেই অমনি তড়পানি! বর্গাদারের সঙ্গে আখেজের সম্পর্ক নয়—জবেদকেই আচ্ছা করে একটিবার নাড়া দেওয়ার দরকার। সেই ব্যবস্থা হয়েছে।

পেয়াদা এসেছে বেলা থাকতে। তাড়াতাড়ি তাকে ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে দরজা এঁটে দিল। কেউ না দেখে ফেলে, ঘুণাক্ষরে প্রকাশ না পায়। তবে তো মালপত্র সরিয়ে ফেলবে। শিল করতে গিয়ে দেখা যাবে, রয়েছে মাটির হাঁড়িকুড়ি কতকগুলো, আর মানুষ।

মানুষগুলো খ্যা-খ্যা করে হাসবে। টাকা বরবাদ, অপমানের এক শেষ।

পোহাতি-তারা উঠলে জবেদের বাড়ির সামনে গাছতলায় আখেজ সদলবলে এসে বসলেন। রাত্রে বাড়ি ঢোকা বেআইনি, ভোরের অপেক্ষা করছে সকলে। কাক ডেকে উঠল, অতএব ভোরের আর বাকি কি? গোয়ালে ঢুকে সোনাকে বের করে আনল সকলের আগে। রান্নাঘরের থালা-ঘটি-বাটি ঝনঝন করে ছুঁড়ে দিচ্ছে। তখনই জবেদ ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। আয়েসাও উঠেছে। উঁকি দিয়ে দেখে জবেদ হাসির মতন ভাব করে: হি-হি—ফাটা থালা, ঘটিতে ধুনোর পটি, বাটি সব পিতলের। নিয়ে যাও, বয়ে গেল! কলাপাতায় ভাত খাব, নারকেলের মালার বাটি। আটকে থাকবে?

এক গাঁয়ের মানুষ হয়েও পেয়াদার আসা টের পায় নি—অত হাসি হেসে সেই আহাম্মুকি ঢাকবার প্রয়াস। আখেজের লোক ওদিকে আউড়িতে উঠে পড়েছে। গত বছরের ধান কিছু নেই। নতুন ধান বেশি ওঠে নি এখনো। পাঁচ-দশ খুঁচি যা পেল, সমস্ত পেড়ে ফেলেছে। আমিনুর তক্তাপোশে ঘুমুচ্ছে, আখেজ গিয়ে খিঁচিয়ে উঠলেন: নবাবের বেটার পালঙ্কে বিছানা! ছেলে তুলে দে শিগগির।

গায়ে জ্বর----

জ্বর তা তোর পালোয়ান বউটা কি করে? ঘাড়ে করে নিয়ে যাক। জ্বর বলে তক্তাপোশখানা ছেড়ে যাব ভেবেছিস?

মালপত্র সমস্ত আখেজের বাড়ির উঠানে এনে জমা করল। দুটো তক্তাপোশ, থালা-বাটি-গেলাস, হ্যারিকেন-লণ্ঠন, কাঁথা-মাদুর-বালিশ, গুড়ের নাগরি আধখানা। ধান এসে পৌঁছয় নি এখনো, জবেদের বাড়ি বস্তা ভরতি করছে। আখেজ দশের মুকাবেলা সমস্ত লিস্টি করে ফেলছেন। সিকিখানা মালও পাচার হয়েছে, এমন কথা না উঠতে পারে।

অনেক মানুষ এসে জুটেছে। নি-খরচায় মজা দেখা তো বটেই, তা ছাড়া সস্তায় দাঁও মারবার ফিকিরে আছে কেউ কেউ। জবেদ, ধরো, কিছু টাকা দিয়ে আখেজের সঙ্গে ফয়সালা করে নিল। এবং পেয়াদাকে পান খেতে দিল যথারীতি। মালপত্র ছেড়ে পেয়াদা সদরে গিয়ে লেখাবে, তেমন-কিছু অস্থাবর পাওয়া গেল না। এমন হামেসাই হয়ে থাকে; ধরা যেতে পারে, এইটাই নিয়ম। টাকার ধান্দায় জবেদ দুটো-পাঁচটা মাল সেই সময়ে জলের দামে ছেড়ে দেবে। সেই গূঢ় মতলব অনেকের মনে।

কিন্তু আসল মানুষ জবেদেরই দেখা নেই। মিটমাটের কোন চাড় দেখা যাচ্ছে না। অবশেষে বড় বড় দুটো কাঁচা-বাঁশের আগা টানতে টানতে সে এলো।

পেয়াদা ধমকে ওঠে: ছিলে কোথা জবেদ মিঞা? আমায় সদরে ফিরতে হবে না?

জবেদ বলে, একটা ম্যাচবাক্সও ফেলে আস নি তোমরা। জ্বরো ছেলেটা খাই-খাই করছে—উনুন ধরিয়ে এক ঝিনুক বার্লি ফুটিয়ে দেবে, সে উপায় নেই।

আখেজ বললেন, বাজে কথা থাক। এদিকের কি হবে, তাই শুনি।

জবেদের যেন কানে গেল না। সোনার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলে, সকালবেলা ভরপেট জাবনা খেয়ে তবে বেরোয়। সেটা হয় নি, পেট একেবারে পিঠের সঙ্গে সেঁটে গেছে। তাই বুঝে বাঁশের পাতা নিয়ে এলাম। আজকের দিনটা বেটা বাঁশপাতায় পেট ভরে নে। কী হবে, বেকায়দায় পড়ে গেছিস—

আখেজ বলেন, সদরে চালান হয়ে গেলে ওই বাঁশপাতা দেওয়ারও মানুষ থাকবে না। পঁচিশটা টাকা বের কর। চাপরাসির পাঁচ, আর বিশ টাকা আমি ডিক্রিতে উশুল দিয়ে নেব।

পাতা ছিঁড়ে গরুর মুখে দিতে দিতে জবেদ বলে, পাঁচিশটে পয়সাও গাঁটে নেই গোলদার-ভাই।

আখেজ বিরক্তস্বরে বলে উঠলেন, তবে মিটমাট হবে না। চালান লিখে ফেল পেয়াদা সাহেব।

দীনু বর্ধন সেই জবেদের বাড়ি থেকে আশা করে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। সে বলে, পয়সা আর ক'টা লোকের গাঁটে থাকে জবেদ মিঞা? যাদের আছে, কথাবার্তা বলো তাদের সঙ্গে।...আরে, আরে—গরু যে পালিয়ে যায়! গরু বেঁধে রাখ নি তোমরা?

নটা চৌকিদার সবিস্ময়ে বলে, শিঙের দড়ি খুলল কেমন করে গো?

চোখ-ভরা হাসি জবেদের। বলে, সোনা আমার গুণ জানে। মন্তোর পড়ে চোরে তালা খুলে ফেলে শোন নি? সোনা শিঙের দড়ি খোলে তেমনি কায়দায়।

আখেজ চেঁচাচ্ছেন: কি কর তোমরা? ধর, ধরে ফেল। গরুটাই গেল তো আজেবাজে কোন ছাই চালান যাবে?

জবেদ ছুটে যায় সকলের আগেভাগে: আয় রে সোনা, আয় আয়—। সদরে চালান যাবি, বজ্জাতি করিস নে।

সোনা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে। আখেজের উঠান থেকে নেমে একটু দূরেই কাদা। এ অঞ্চলের সুবিখ্যাত চোরকান্নার কাদা। কোন জাঁদরেল চোর নাকি পালাবার মুখে কাদায় আটকে ধরা পড়ে যায়। লোকে বলে, আকাশে মেঘ করলেই ওখানটা কাদা হয়ে যায়। কিন্তু মাসখানেকের ভিতর মেঘ করে নি, এক ফোঁটাও বৃষ্টি পড়ে নি। চোরকান্না জায়গাটার উপরে সরের মতন একটা পর্দা পড়ে আছে। তাই আরো বিপদ—শুকনো মাটি ভেবে অসতর্ক পথিক পা চাপিয়ে দেয়। পর্দাটুকু তলিয়ে যায় পায়ের চাপে—নিচে অতল গভীর ক্ষীরসমুদ্র—মসীবর্ণ ক্ষীর। আর তখন যাবে কোথায়? কোন

রসিক জন পন্ত বেঁধেছে—চোরকান্নার মাটি, দুই ঠ্যাং আর লাঠি। কিন্তু সোনা আর সোনার পিছনে জবেদ ছুটেছে ঐ দেখ। ওরা যেন বাতাসের প্রাণী, কাদায় ওদের পা আটকায় না, আলগোছে কান্নার উপরে ছুটেছে।

আখেজ গোলদার দাওয়ার উপর ডিঙি মেরে আরও লম্বা হয়ে দেখছেন: এঃ—গরু ধরতে গেল, না গরু তাড়িয়ে নিয়ে চলল? তোমরা যে সব বাবু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে?

চৌকিদার বলে, যা কাদা—

জবেদ যায় কেমন করে?

ও একটা মনিষ্যি নাকি?

বঙ্কিম বলে, যখন বাঁশপাতা খাওয়াচ্ছিল, বুঝলেন গোলদার সাহেব, জবেদই চুপিসারে শিঙের দড়ি খুলে দিয়েছে।

আখেজ আগুন হয়ে বললেন, এক টাকা বখশিস, গরু যে ধরে নিয়ে আসবে।

টাকার লোভে অনেকে কাদায় নেমে পড়ল। যাবে কোথা? পাখনা নেই যে, গরু ফুড়ুৎ করে আকাশে উঠে পড়বে।

কিন্তু গোলমাল আর এক দিক দিয়ে। গরু ধরে আনল, জবেদও এসেছে। গোপেশ্বর হঠাৎ উদয় হয়ে দাবি করেন: গরু আমার। আমার গরু বেহুদা তোমরা ক্রোক করে এনেছ।

তল্লাটের মধ্যে গোপেশ্বর ডাক্তারকে না জানে কে? পেয়াদাও জানে। তবু বলল, এটা কি বললেন ডাক্তারবাবু? জবেদ মিঞার গোয়াল থেকেই তো গরু আমরা ক্রোক করে আনলাম।

গোপেশ্বর বলেন, বক্তার খাঁ এর মাকে দিয়েছিলেন। দরকার হলে বক্তার খাঁ সাক্ষি দেবেন। লোকজনের অসুবিধা বলে আমার গরু জবেদের গোয়ালে বড় হচ্ছে। আপোষে তোমরা ছেড়ে দাও ভাল, নয়তো দস্তুরমতো খেসারত আদায় করব। ছেড়ে কথা কইব না।

ডুবন্ত মানুষ বড়-গুঁড়ির আশ্রয় পেয়েছে, হাঁ-হাঁ করে জবেদও ঘাড় কাত করল।

বক্কার খাঁ বড় জোতদার—পেয়াদা তাঁকেও চেনে। সদরের যাবতীয় উকিল-মোক্তার আমলা-মুহুরি এই তল্লাটের দুটো মানুষকে চিনে রেখেছে—আখেজ গোলদার আর বক্কার খাঁ। দু-চার নম্বর মামলা সর্বদাই লেগে আছে এঁদের।

পেয়াদার কোন দায় পড়েছে গেঁয়ো গণ্ডগোলে মাথা ঢোকানোর? বলে, রাগ করেন কেন ডাক্তারবাবু? বুঝে দেখুন কথাটা। চালান কি শখ করে কেউ দিতে যায়? গোলদার সাহেব কত বলছেন, জবেদ মিঞা কোন কথা কানে নেবে না।

জবেদ বলে, পঁচিশ টাকা আমায় পাঁচবার বেচলেও হবে না।

গোপেশ্বর বলেন, অনায্য বললে হবে কেন বাপু? পঁচিশ নয়, পাঁচ। সে পাঁচ টাকা আমি দিয়ে দিচ্ছি।

বলেন কি! পাঁচ টাকার মধ্যে আমি কি নেব, ডিক্রিতেই বা কি উশুল পড়বে?

তুমি দুই নাও, আখেজ গোলদার তিন। কি তুমি তিন, উনি দুই। আপোষে ভাগাভাগি করে নাও। হিসেব করে দেখ, ফুটো ঘটি আর ক-খুঁচি ভুষিধান খরচখরচা করে সদর অবধি নিয়ে পাঁচ টাকার বেশি মুনাফা হবে? গরুর আশা ছেড়ে দাও। জোর করে নিলে ফ্যাসাদে পড়বে। নিতেই পারবে না। খবর দিলে বক্কার খাঁ আর তাঁর ছেলেরা এসে পড়বে। ওদের পিছনে গাঙ-পারের যাবতীয় লোক।

বলে গোপেশ্বর এগিয়ে গরুর দড়ি হাতে তুলে নিলেন। পেয়াদা আখেজকে একদিকে ডেকে নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে, ডাক্তার মানুষ—সবাই ওকে মান্য করে। আর পিছনে রয়েছে বক্কার খাঁ—এক নম্বর ফিচেল, দিনকে রাত বানিয়ে মামলা সাজিয়ে ফেলে। ওদের গরু আমি চালান দিতে পারব না। পরোয়ানা ফেরত দিয়ে দেব।

আবার ডিক্রিজারি করে আপনি অন্য প্রফেসর-সার্জার আনিয়ে যা হয় করবেন। আমার দ্বারা হবে না।

চেঁচিয়ে বলে, গরু নিয়ে চললেন যে ডাক্তারবাবু। টাকা ?

গোপেশ্বর হেসে বলেন, দিতে কি গররাজি ? চাইলেই দিয়ে দিই বাপু। তোমাদেরই তো কথার শেষ হয় না।

নোট নয়, রূপোর টাকা। টুং-টুং করে নখে বাজিয়ে পাঁচ টাকা দিয়ে দিলেন। জবেদকে বললেন, তোমার মালপত্তোর বুঝসমঝ করে বাড়ি নিয়ে যাও। আমার গরু নিয়ে আমি এগোই।

নিচু গলায় আবার বলেন, তোর বউ গিয়ে পড়েছিল মা'র কাছে মা-ও জ্বরে ভুগছেন, মেজাজ খিটখিটে। মা'র সেই সময়ের রাগ যদি দেখতিস! আমি রোগির বাড়ি যাচ্ছি—মা বললেন, গোলদার-বাড়ি গিয়ে আগে হাঙ্গামা চুকিয়ে আয়। সর্বস্ব নিয়ে গেছে—দিন দুপুরে ওরা ভিটের উপর না খেয়ে শুকোবে, সে কিছুতে হয় না। রোগি ছেড়ে তাই এখানে ছুটলাম। রুগ্নের জন্য কি কি পথ্যিও পাঠিয়ে দিলেন তারাকে দিয়ে। যাক গে, ভালয় ভালয় মিটল, সদরে দৌড়তে হল না, ঝঞ্ঝাট আর বক্তার খাঁ অবধি গেল না।

আপাতত আর কোন মজা দেখা যাচ্ছে না, ভিড় পাতলা হয়ে [illegible]। আখেজ বলেন, কাজটা কি ভাল হল জবেদ ? দশের মুকাবেলা তুমি ওই স্বীকার করে গেলে, গরু কিন্তু ষোলআনা ডাক্তারের হয়ে গেল। পঁচিশ চাইলাম বলেই কি আর পঁচিশ দিতে ? ওদের সঙ্গে তোমার বড্ড দহরম-মহরম, গোপেশ্বর ডাক্তারের পা চেটে বেড়াও। সমাজে কথা উঠছে এই নিয়ে।

সমাজ ? সমাজের নামে জবেদ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে : সমাজ কি খেতে দেয়, ভালমন্দ খবরাখবর নেয়, দৃষ্টিসুখ দিয়ে থাকে ? এ-গাঁয়ে সমাজ বলতে তো তুমি! তাই আমার রোগা ছেলেটাকে মাটিতে নামিয়ে তক্তাপোশ ক্রোক করে নিয়ে এলে।

ধানের বস্তা মাথায় নিয়ে হনহন করে জমেদ চলল। বাড়িতে এসে দেখে, রূপো কাঁঠালতলায় শুয়ে পড়ে আধেক চোখ বুজে আরামে জাবর কাটছে। পেট টনটন করছে, অর্থাৎ সারারাত ধরে উত্তম চৌর্যবৃত্তি চলেছে। গরুর কাণ্ড দেখে এতক্ষণের মনের গুমোট কেটে যায়। হাসিতে সে ফেটে পড়ল: বহুৎ আচ্ছা বেটি, সাবাস। আদরে থাবা দেয় রূপোর কাঁধের উপর: আমরা কেউ জানলাম না, বেটি তুই পেয়াদার খবর কেমন করে টের পেলি বল তো? গোয়ালে পেলে তোকেও টেনে নিয়ে যেত সোনার মতন। সোনাটা হল ছটকো গোঁয়ার, তোর গভীর বুদ্ধি।

তারার বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে। বয়স কম, দুর্গার যে সময় বিয়ে হয়েছিল তার চেয়ে অনেক কম বয়স। কিন্তু দিনকাল বড় তাড়াতাড়ি পালটে যাচ্ছে। হিন্দু আর মুসলমানে এটা-ওটা নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ আগেও না হয়েছে এমন নয়। আবার ভাবসাব হয়ে গেছে। এ-তরফে ও-তরফে বিস্তর সাধুবাক্য বলাবলি হয়ে একেবারে অভিন্নহৃদয় হয়েছে সময় সময়। কিন্তু এখনকার মন-কষাকষি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠল। অবিচ্ছেদি জ্বরের মতন—এ-বেলাটা কিছু কম দেখাই যাচ্ছে, ও-বেলা হু-হু করে তাপ উঠে গেল; একেবারে ছাড়ে না। দু-জন পাঁচ জন মুসলমান এক জায়গায় হলেই হিন্দুর প্রসঙ্গ উঠে পড়ে—হিন্দুর দোষ আর দুষ্কৃতি। হঠাৎ হিন্দু কেউ এসে পড়লে চুপচাপ হয়ে যায়। সামলে নিয়ে তারপরে—ভাল পাট হয়েছে অমুকের জমিতে, মোটা কইমাছ বিলে এবার আর পড়ছে না—এমনি সব নিরীহ কথাবার্তা। হিন্দুর ভিতরেও ঠিক এমনি ব্যাপার। আমেদ কম্পাউণ্ডার—আত্মীয়জন কেউ নেই, ভিন্ন মহাকুমায় বাড়ি, হাই-ইস্কুলের কয়েকটি ক্লাস অবধি পড়েছে। কোন সূত্রে খবর পেয়ে

তারাকে অ-আ পড়াবার জন্য গোপেশ্বর ডাক্তারের বাড়ি এসে আশ্রয় নেয়। পড়াত আর হাটবাজার করত। প্রমোশান পেয়ে তারপর ওষুধের বাক্স ঘাড়ে করে ডাক্তারের সঙ্গে রোগির বাড়ি যেত। এবং আরও পরে হাটখোলার ডাক্তারখানায় কম্পাউণ্ডার হয়ে বসল। সেই আমেদ এখন ষোলআনা ডাক্তার। মস্তবড় আত্মীয় জুটে গেছে ইদানীং—আখেজ গোলদার। বসা-ওঠা তাঁর বাড়িতে। তাঁরই একখানা চালাঘরের বেড়ায় তক্তার উপর ডাক্তার ফরহাদ আহ্‌মদ নাম লিখে ঝুলিয়ে দিয়েছে। রোগির ভিড়ে চালাঘরে নাকি জায়গা হয় না। সে তো পরম সুখের কথা—তাঁর কাছে সাগরেদি করে কম্পাউণ্ডার দুটো পয়সা করে খাচ্ছে। গোপেশ্বর সেজন্য ব্যাজার নন। কিন্তু মিথ্যা রটিয়ে রোগি ভাঙায়—নাকি, গোপেশ্বর মুসলমান রোগিদের যত্ন করে দেখেন না, অসুখ দীর্ঘস্থায়ী করে পয়সা পেটাবার মতলবে আজেবাজে অষুধ দেন। এই রকম করতে গিয়ে গোপেশ্বরের হাতে মরেওছে নাকি দু-চারটে। ভাল লোকে বিশ্বাস করে না, তারাই এসে পুটপুট করে আবার গোপেশ্বর কাছে লাগায়। তা হলেও কথাটা অতি জঘন্য। তাঁর সঙ্গে থেকে মানুষ হল—সেই আমেদের মুখ থেকে এইসব বেরুচ্ছে। গোপেশ্বর তিতবিরক্ত হয়ে গেছেন। তারার বিয়ে হয়ে গেলে আর কোন দায় রইল না—ডাক্তারি ব্যবসায় ছেড়ে দেবেন তার পরে। এমনও ভাবছেন, পোড়া দেশ ছেড়ে চলে যাবেন। ঘরবাড়ি আসবাবপত্তোর আওলাত-পশার কতক বিক্রি করে কতক বা দুই জামাইয়ের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে দিয়ে বুড়ো মা আর নির্মলাকে নিয়ে তীর্থে বেরিয়ে পড়বেন, কাশীধামে গঙ্গাতীরে ভগবানের নাম করে কাটিয়ে দেবেন জীবনের বাকি দিনগুলো। সেটা যদি না হয়, অন্ততপক্ষে দক্ষিণে গিয়ে সুন্দরবনের বাদায় খান দুই ঘর তুলে সেইখানে থাকবেন। মানুষের মতিগতি যখন এই, মানুষের চেয়ে জন্তু-জানোয়ার ভাল।

মাঝামাঝি রকমের একটা সম্বন্ধ এলো। খনার বিয়ে হয়ে গেছে ইতিমধ্যে, তারই ছোট দেওর। জানাশোনার মধ্যে বলে গোপেশ্বর ঝুঁকলেন। ছেলে পাশটাশ করে নি। করবেও না—লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়ে বসেছে। কিন্তু তিনটে পাশ-করা জামাই নিরঞ্জন—তাকে দিয়েই বা কি হল? গাঁয়ে দশটা বিষয়ভোগী পাটোয়ারি মানুষ থাকে, নিরঞ্জনও তাদের একটি। মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে সদরে পড়ে থাকে। আর সেই এক বিষম ভয়ের কথা বলেছিল দুর্গা—যা রটে তার খানিকটা অন্তত বটে! কলেজে পড়বার সময় কেষ্টবিষ্টু হবার কিছু আকাজ্ক্ষা ছিল, আজকে কোথাও তার একবিন্দু ছাপ নেই—না আলাপ-আচরণে না চেহারার মধ্যে। সে তুলনায় খনার দেওর অনেক ভাল। বাপ-মা বর্তমান—চার ভাই, এক বোন। এই ছেলে সকলের ছোট। মাথার উপর অতএব বিস্তর অভিভাবক, স্বাধীন হয়ে উড়বার শক্তি কোন দিন হবে না। দাবিদাওয়ার ব্যাপারেও পাত্রপক্ষের ঘোরপ্যাঁচ নেই, পণ সম্পূর্ণ নগদ টাকায় চাচ্ছেন। নগদ তিনটি হাজার। হিন্দুস্থান-পাকিস্তান নিয়ে গণ্ডগোলের কথা চারিদিকে—হেন অবস্থায় মানে মানে সরে পড়া উচিত। খনার শ্বশুর বর্ধমানের কাছে কিছু ডাঙা-জমি ও ধানজমি কিনেছেন। অর্থাৎ একখানা পা নির্বিঘ্ন স্থানে ফেলে রাখলেন, বেকায়দা বুঝলে এদিককার পাখানিও তুলে নিয়ে পুরোপুরি সরে পড়বেন। আরও হাজার তিনেক লাগবে এই ব্যাপারে। এত কম বয়সে ছেলের বিয়ে দেওয়াও সেইজন্য। বউ যেমন-তেমন হোকগে, টাকা চাই পুরো তিনটি হাজার। ছেলে এর উপরে ফরমাস করেছে সাইকেল একখানা। সেটা কিছু বড় কথা নয়, তা-ও দেবেন গোপেশ্বর। একদিন ছেলের বাপ এসে পাকা-কথা বলে গেলেন। তারাও বয়সে ছোট—মানাবে দুটিতে চমৎকার। এই তবে ঠিক রইল। জ্যৈষ্ঠ মাসে। শুভকর্মে দেরি করা কিছু নয়।

তবু কিন্তু ব্যাঘাত ঘটল। বড়গিন্নি মারা গেলেন এই সময়টা। রোগপীড়া সেই যা চলে আসছে, বাড়াবাড়ি কিছু নয়, মারা গেলেন হঠাৎ। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন গুটিকয়েক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করেছেন। এমনি বড় নড়াচড়া করেন না, কিন্তু ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যাপারে সামনাসামনি না থেকে পারেন কি করে? হাঁকডাক করছেন, দরকার মতো এটা-ওটা হাতে করে এনে দিচ্ছেন। কাজ মিটল, দক্ষিণা নিয়ে ব্রাহ্মণসজ্জনেরা বিদায় হলেন। নিজে প্রসাদ পাবেন এইবারে। শুয়ে পড়েছেন ক্লান্তিতে, একটুখানি গড়িয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু অনেকক্ষণ তো হয়ে গেল, ডাকাডাকিতে ওঠেন না। গোপেশ্বর তক্তাপোশের পাশে এসে হাতখানা তুলে ধরতে গিয়ে মা-মা—করে কেঁদে উঠলেন। হরেরাম হরেরাম রামরাম হরে হরে—নাম শোনাচ্ছে। কিন্তু কানে শোবার অবস্থা পার হয়ে গেছে; ব্রহ্মতালুতে রক্ত উঠে মৃত্যু হয়েছে। লোকে বলছে, উপযুক্ত বয়সে সমস্ত বজায় রেখে ড্যাখ-ড্যাখ করে স্বর্গে চলে গেলেন, ইচ্ছামৃত্যু একে বলে, শোকের ব্যাপার কিছু নেই। একটা জিনিস কেবল—কালাশৌচের জন্য তারার বিয়ে এক বছরের জন্য আটক হয়ে রইল।

মৃত্যু নয়, উৎসব যেন একটা। ধবধবে থান-কাপড় পরনে, মাথার চুলেরও ঐ থান-কাপড়ের রং। খাটের উপর তোষক-চাদর পেতে শুইয়েছে, আর একটা চাদরে ঢেকে দিয়েছে গলা অবধি। মরেন নি যেন, বিস্তর কাল ধরে জীবন-ধারণের ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। পরিতৃপ্তির ঘুম ঘুমাচ্ছেন। পড়শিদের রকমসকম আজকাল মোটেই ভাল না, সবসময় কি-হয় কি-হয়—এমনি এক অবস্থা। কিন্তু ডাক্তারবাবুর মা মরেছেন—এই ব্যাপারে একটা দিন আজ উদ্বেগ ভুলে মানুষজন ভেঙে এসে পড়েছে। পাড়াগাঁ অঞ্চলে বলামাত্রই কীর্তনের জোগাড় হয় না। কিন্তু ডাক্তারবাবুর মা মরেছেন—

বলতেও হল না কাউকে। এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে যে ক'টা কীর্তনের দল আছে, জুটে পড়ে নিজেরাই চলে এলো। অক্ষয়-তৃতীয়ার পুণ্য দিনে ইচ্ছামৃত্যু বরণ করলেন, বলতে পারা যায়—এ হেন ভাগ্যধরীর কানে হরিনাম শোনানোয় পুণ্য নিজেদেরও। খোল-কত্তালে তোলপাড় লাগিয়ে শবের পিছন ধরে যাচ্ছে কীর্তনিয়ারা। সামনের দিকে এক দল খই আর পয়সা ছড়াচ্ছে। বল হরি, হরিবোল—হরিধ্বনি মুহুর্মুহু। হরির লুঠের মতো পয়সা ছড়াচ্ছে—ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি পয়সা কুড়ানোর জন্যে। বেণীর শ্মশান ক্রোশ দেড়েক পথ। যত এগুচ্ছে লোক বেড়ে যাচ্ছে ততই। এ-তল্লাটের কোন হিন্দুবাড়ি পুরুষ-ছেলে পড়ে নেই বোধ হয় একটি। সকলে পথে জুটেছে। মড়ার খাটে কাঁধ দেবার জন্য মানুষ ব্যস্ত। দু-পা যেতে না যেতে ভিন্ন মানুষ এসে বলে, ডাক্তারবাবুর মা যাচ্ছেন—সরো সরো—আমায় একটু নিতে দাও। দেড় ক্রোশ পথ কেমন করে এলো, টেরই পেল না কেউ। গাড়ি গাড়ি কাঠ এসে পড়ে মড়া পোড়ানোর জন্য।

এরই মধ্যে দেখা গেল, সোনা আর রূপোর পিঠে কাঠ বেঁধে ঝুলিয়ে জবেদ তাড়িয়ে নিয়ে আসছে। আখেজ গোলদারের বাড়ির সামনে তখন। হুড়কোর সামনে আখেজ আর আমেদ দাঁড়িয়ে। জবেদকে দেখে আখেজ রাগে আগুন: হারামির পুতের কাণ্ডখানা দেখ চেয়ে। গোপেশ্বর ডাক্তারের কাছে দাসখত লিখে দিয়েছে, মড়ি-পোড়ানোর কাঠ বয়ে নিয়ে শ্মশানে চলল।

বলতে বলতে চেঁচিয়ে ওঠে: ফি নারে জাহান্নামা খালেদিনা ফি-হা—

আস্তে, আস্তে। ক্রুদ্ধ আখেজের মুখের উপরে হাত চাপা দেবে না কি করবে আমেদ ভেবে পায় না: আহা কি করেন, ওরা যে শুনে ফেলবে। কথা-কথান্তর হবে এই নিয়ে। যা বলবার মনে মনে বলেন।

শুনে ফেলেছেও বোধ হয় জবেদ। আখেজের দিকে কটকট

কয়ে তাকিয়ে গরু খেদিয়ে সে এগিয়ে যায়। ঘুরে ঘুরে আসছিল, একেবারে দলের ভিতরে এসে গেছে এবার। হীরু বর্ধন দেখে হেসে ওঠে: এই দেখ, জবেদ আবার কাঠ নিয়ে এসেছে। কাঠের পাহাড় হয়ে গেল যে! একা জ্যেঠাইমা কেন, গাঁ সুদ্ধ মানুষ দাহ করা যায় এই কাঠ দিয়ে।

যজ্ঞ হালদার হুসান দিয়ে বলেন, করতে হবে তাই। এক কুচি কাঠ ফেলে দিয়ে যাচ্ছি নে। লাইনবন্দি চিতে সাজিয়ে ছ্যাঁচড়া কূটকচালে যত বেটা হাঙ্গামা জমানোর তালে আছে, হাত-পা বেঁধে সবগুলোকে চিতের আগুনে চালান করব। পুড়ে ছাই হয়ে যাক, মানুষ তবে সোয়াস্তিতে বাঁচবে।

কথা শুনে জবেদও এতক্ষণে হেসে ফেলে: করেন সেইটে মাস্টার মশায়। ওই যে দেখেন আখেজ বুড়ো—আগে কিন্তু এত দূর ছিল না। বড়গিন্নি ঠাকরুন মরে গেছেন, তবু তাঁকে রেহাত করবে না। জাহান্নামের ডাক ডাকে, জাহান্নামের আগুনে গিয়ে থাকতে বলছে। যে রকম বেয়াদব, ওর বরাতেই আছে সেটা। গিয়ে তখন জাহান্নামের আরামটা বুঝে নেবে।

আবার কৈফিয়তের ভাবে বলছে, রূপো তো ডাক্তারবাবুরই। রাখাল হয়ে আমি চরিয়ে নিয়ে বেড়াই। গরুকে বললাম, এত লোক যাচ্ছে, যাবি নাকি রে মা-ঠাকরুনের শেষ-দেখা দেখতে? বুন যাচ্ছে তো ভাইটাও পিছু নিল। শুধু শুধু কেন আসবে, ক'খানা কাঠ পিঠে করে এনে শেষ-কাজে দিল। তাই কি আমার বড্ড দোষ হয়ে গেল?

ভাবছে এখন ওই মরা মানুষটার কথা। বিধবা মানুষ, বয়সে বুড়ো—'ছুঁসনে' 'ছুঁসনে' করতেন, সেটা কিছু নয়। আসলে বড়গিন্নি ভালই, মনে মনে দরদ ছিল। রোগির বাড়ি থেকে ডাক্তার নিতে এসেছে—গোপেশ্বর হাঁকিয়ে দিলেন, যেতে পারব না। তখন বড়গিন্নির কাছে গিয়ে তারা কেঁদে পড়ল। বড়গিন্নির হুকুমে শীতের নিশিরাত্রে

তড়তড় করে বেরিয়ে চললেন ডাক্তারবাবু। এমন কত বার ঘটেছে! পড়শি মানুষ জবেদ—কোন খবরটা সে না জানে? বাড়ির জিনিস-পত্র যেদিন ক্রোক করে নিয়ে গেল, গোপেশ্বর ওই যে আখেজের বাড়ি গিয়ে মিটমাট করে দিয়ে এলেন—বড়গিন্নি হুকুম করলেন, সেই জন্যেই তো! কত জনের এমনি ভাল করেছেন, কান্না ঘুচিয়ে হাসি ফুটিয়েছেন কত জনের মুখে! আহা, তাঁরও মুখ যেন হাসিতে ভরে থাকে এন্তেকালের পরে। খোদার আরজে না পৌঁছে আখেজের মুখের ঐ সব কথা!

আরও দুটি আসছে—অনেকটা পিছনে বলে তাদের কেউ দেখতে পায় নি। রাস্তা দিয়েই আসে নি। তারার বিয়ের কথা উঠছে। ম্যাচ-ম্যাচ করে শ্মশানে-মশানে আসছে—লোকে দেখলে বদনাম করবে। তবু শ্মশানঘাট গাঁয়ের উপরে হত যদি! কিন্তু এত মানুষ আসছে, তারা বাড়ি বসে সোয়াস্তি পায় না। লুকিয়ে চলে এসেছে। আর সে যাচ্ছে তো আমিনুরও চলল পিছু পিছু।

নতুন চাষ দিয়েছে মাঠে, ডেলা-বন ভাঙতে ভাঙতে পায়ের তলা ব্যথা হয়ে যায়। হঠাৎ নুর নিশ্বাস ফেলে বলে, তোর ঠাকু-মা মানুষ বড্ড ভাল ছিল রে তারা।

তারা বলে, মুখে খিচখিচ করতেন বটে, কিন্তু ভালবাসতেন সকলকে।

নুর বলে, আমাকেও বাসত। জ্বরে পড়ে ছিলাম—সেই যেদিন গোলদার-বাড়ি থেকে সমস্ত শিল করে নিয়ে গেল, আমায় টেনে-হিঁচড়ে মাটিতে নামিয়ে তক্তাপোশটাও নিল—তার পরে দাদি সেইদিন কমলালেবু নাসপাতি কত সব পাঠিয়ে দিল আমার জন্যে। তুই এসে দিয়ে গেলি তারা। মনে নেই?

তারা বলে, ঠাকু-মারও জ্বর সেই সময়। আর অরুচি। বাবা

সদরের গঞ্জ থেকে ঐ সমস্ত ফল এনেছিলেন, ঠাকু-মা নিজে না খেয়ে তোকে সব দিয়ে দিলেন।

ঝুর বলে, নাসপাতি সেই আমি খেলাম। আর খাব না, ঐ সমস্ত কে আর পাঠাবে?

শ্মশানের কাছাকাছি এক খেজুরবনী। খেজুরবনে উঠে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখছে দু-জনে। হাঙ্গামা তো অনেক—মড়ি চান করাতেই এতক্ষণ লাগল। সন্ধ্যা হয়ে আসে। তারা বলে, চিতে কী বড় হয়েছে, দেখছিস ঝুর! খাটের চেয়েও উঁচু। খাট থেকে তুলে এবারে ঠাকু-মাকে চিতের উপর শুইয়ে আগুন ধরিয়ে দেবে। আর কিছু দেখবার নেই। ফিরি ভাই এখন। দিনমানে অত হোঁচট খেয়েছি, রাত হলে আরও কষ্ট।

ঝুরের চোখে জল এসে যায়ঃ পোড়াবে দাদিকে চিতেয় তুলে—উঃ!

তোদের হলে মাটি দিত। তাতে আরও কষ্ট রে! মাটি চাপা পড়ে অন্ধকারে একা একা থাকতে হয়। দিন-মাস-বছর ধরে থাকা। তার চেয়ে তো পুড়ে যাওয়া ভাল।

ঝুর ভাবতে ভাবতে আসছে। মাটি চাপা পড়ে থাকা কিংবা আগুনে পোড়া—ভাল কোনটাই নয়। বেঁচে থাকাই ভাল সকলের চেয়ে।

কয়েক পা নিঃশব্দে গিয়ে তারা আবার বলে, ঠাকু-মা চলে গেল ঝুর। এবারে তুই আমাদের ঘরে আসবি। ঘরে ঢুকে নাচবি তক্ত-পোশের উপর। কেউ কিছু বলবে না আর তোকে।

ঝুর বলে, তা হোক, তা হোক। বেঁচে থাকলেই ভাল ছিল। দাদি মরতে গেল কি জন্যে?

আট-দশ জন মিলে কলসি কলসি জল ঢেলে চিতা নিভাল। এমন

পোড়া পুড়েছে, এক কণিকা হাড় খুঁজে পাওয়া যায়। অথচ পেতেই হবে। হাড়ের একটুকু নিয়ে সযত্নে শামুকের খোলে পুরে রাখে। পরে ঐ বস্তুটা নিয়ে চলে যাবে কলকাতায়, গঙ্গার ঘাটে পুরুত ডেকে ক্রিয়াকর্ম করে জলে ফেলে দেবে। গঙ্গাহীন দেশ—মৃতের গঙ্গাপ্রাপ্তি এই নিয়মে ঘটে। পুরা মানুষটা না হোক, তার দেহের অস্থি পড়ল গঙ্গার জলে। কিন্তু বড়গিন্নির হাড়গোড় নাড়িভুঁড়ি অবধি পুড়ে কয়লা। অগত্যা কয়লাই একখানা তুলে নিতে হল। অস্থি নয়, কয়লা পড়বে গঙ্গায়।

শ্মশানবন্ধুরা বাড়ি ফিরবে, গোপেশ্বরের লোক তার আগেই হাট-খোলায় ছুটেছে। সব ক'টা ময়রার দোকান ঘুরে সন্দেশ-রসগোল্লা নিয়ে এলো। একটার বেশি তবু হাতে দেওয়া যায় না, এত মানুষ। জবেদও পেয়েছে একটা। নিতেই হল, নয় তো মৃতের অকল্যাণ।

বড়গিন্নির শ্রাদ্ধের সময় দুর্গা এলো। আদরের বড় নাতনি, কাজের ক'দিন আগেই এসেছে। স্টেশন থেকে গরুর গাড়ি করে বাইরের উঠানে নামল। কিন্তু দুর্গা বটে তো? দুর্গাও বুঝি মরে গিয়েছে এর মধ্যে, বাপের বাড়ির কেউ জানতে পারে নি, আধ-পোড়া কঙ্কাল চিতার উপর থেকে নেমে এসেছে একখানা শুকনো চামড়া গায়ের উপর জড়িয়ে। তাই সত্যি। গাড়ির ছইয়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো, মাথার চুল ঝুটি করে বাঁধা, গলায় আর বাঁ-হাতে একরাশ মাদুলি, কপালে সিঁদুরের নিচে মাটির ফোঁটা বিশাল আয়তনের। কাঁখে দেড়-মাসের ছেলেটা। ছেলে আরও দুটো পিছে পিছে নামল। এই মায়েরই ছেলে সেটা আর বলে দিতে হয় না, চেহারায় মালুম। সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, টলে পড়ে যাবে বুঝি। তারা ছুটে গিয়ে কোলে তুলে নিল ছোটটিকে। অন্যটির হাত ধরল।

বাচ্চাদের নাম কি রেখেছ দিদি?

টম ডিক আর হ্যারি।

আর নাম খুঁজে পেলে না ?

দুর্গা বলে, কচুর যেটা ঘেচুই হবে। বাহারে নাম দিয়ে মানুষ ঠকাব কেন রে ?

নির্মলা তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়ে নেন : জামাই এলো না ?

ঘাড় নেড়ে দুর্গা দালানের ভিতর ঢুকে যায়। নির্মলা পিছনে আছেন। আবার বললেন, আসবে তো জামাই কাজের মধ্যে ?

দুর্গা বলে, মামলা লড়ছে। সদর ছেড়ে নড়ে কি করে ?

নির্মলা দুঃখিত স্বরে বলেন, একটা-দুটো দিন ফাঁক করে নিতে পারে না ? মা তো রোজ মরছেন না। বাড়ির একটা জামাই— লোকেই বা কি বলবে।

কানে তুলো দিয়ে থাকে তোমার জামাই। লোকের কথা তার কানে ঢোকে না।

এমন করে কথাটা বলল, মায়ের প্রাণ টনটন করে ওঠে। সংসারে সুখ-শান্তি নেই, সে তো বোঝাই যাচ্ছে। নির্মলা বলেন, এলি তুই কার সঙ্গে ?

ওমা দেখ নি, আমার দেওর ছিল গাড়ির পিছনে। বাবা তাকে নিয়ে বাইরের ঘরে বসালেন। তোমার জামাই বাড়িতে এলো না তো একাই চলে আসছিলাম। শাশুড়ির দয়া হল। বললেন, সে হয় না, বাড়ির মানসম্ভ্রম আছে তো। দেওরকে সঙ্গে দিয়ে দিলেন।

তারপর বলতে লাগল, বাবা নিয়ে গিয়ে বসিয়েছেন। তাড়াতাড়ি জলখাবার করে ডাক দেও। সৎ-দেওর—পান থেকে চুন না খসে। নয় তো বারোমাস আমায় এই নিয়ে গঞ্জনা শুনতে হবে। আমার কাছে ঘুরতে হবে না মা, ওদিকের খবরদারি কর তোমরা সকলে।

কী কাতরতা চোখে মুখে তার। আর তারার দেখ কাণ্ড। একটা

দিনের ভেতরেই বাচ্চা তিনটে বশ করে ফেলেছে। ছোটটা একবার কোলে এলো তো ন্যাকড়ার মতো পড়ে থাকবে, দুর্গা হাত বাড়ালেও তার কাছে যাবে না। মেজো ডিকের ভাল করে কথা ফোটে নি, মাছি-মাছি করে তবু কেমন তারার দিকে থপথপিয়ে যায়।

আয়েসা বউ খুব চুপিচুপি এলো একদিন। বলে, একনজর চোখে দেখে যাব দুগ্গা, সেই জন্যে এলাম। যেন চোর হয়ে পড়েছি, তেমনি করে আসতে হল।

দুর্গা বলে, কি দেখছ চাচি? মরে গিয়ে তোমাদের দুর্গা কি রকম হয়েছে, তাই?

আয়েসা জড়িয়ে ধরে বলে, আমার কাছে লুকিও না দুগ্গা। জামাই যে তখন চোখে হারাত, সে আসে নি কেন?

দুর্গা বলে, কম বয়সের আঁটো দেহ—চোখ দিয়ে শুষে খেত দিনরাত। তিন ছেলের মা হয়ে এখন যে এলিয়ে পড়েছি, পুরুষের নজর বাইরে তাই ছোঁক-ছোঁক করে।

কাজকর্ম মিটে গেল। দেওর চলে গেছে। ক'টা দিন পরে গোপেশ্বর নিজে গিয়ে দুর্গাকে রেখে আসবেন, এই বলে দিয়েছেন। দুর্গা যাই-যাই করে তাড়া দেয়, কিন্তু নির্মলার মায়ের প্রাণ ছাড়তে চায় না এই অবস্থায়—

তাড়া কিসের? থেকে যা না দুটো মাস।

দুর্গা বলে, সে হয় না মা। একলা মানুষ, পিছনে কেউ তো নেই। এখানে আছি, সংসার ওদিকে সিকেয় উঠে আছে।

সেইজন্যে তো বলি। একলা মানুষ, ঝঞ্ঝাট নেই। তুই চলে এলি, সংসার আর রইল কোথা? মা-বাপের কাছে থেকে ক'টা দিন জুড়িয়ে যা।

দুর্গা বলে, এমনিই তোমার জামাই মাসে দুটো-চারটে দিনের বেশি বাড়ি আসে না, আমি এখানে পড়ে থাকলে মোটে আর ও-মুখো

হবে না। বাবা জানেন সমস্ত। আমায় থাকতে বোলো না মা, বাপের বাড়ি থাকার কপাল করে আসি নি।

তবু গড়িয়ে চলল কিছুদিন। এর মধ্যে নিরঞ্জন এসে পড়ল। দুর্গা বোধ হয় চিঠি দিয়েছিল। কি লিখেছিল সে-ই জানে, ফৌজদারি মামলার তারিখ থাকা সত্ত্বেও সাবকাশের দরখাস্ত দিয়ে শ্বশুরবাড়ি এসেছে।

তারা এসে দাঁড়াল। কোলের উপর ছারি, ডানদিকে একটু কাত হয়ে দাঁড়িয়েছে; ডিকের হাতখানা ডান হাতে ধরে আছে। নিরঞ্জন অবাক হয়ে তাকায়ঃ বাঃ রে, দিব্যিটি হয়েছিস যে তারা! সেদিনের একফোঁটা ছেমড়ি খাসা ডাগরডোগর হয়ে উঠেছিস।

আদর করে গালটা টিপে দেয় নিরঞ্জন। যাঃ—বলে হাসতে হাসতে তারা সরে গেল। ডিক পারে না, তবু যাচ্ছে মাসির পিছু-পিছু। হাত বাড়িয়ে নিরঞ্জন ডাকছে, আয় ডিক আয়। অ্যাঁ, মাসি যে বড্ড পেয়ারের হল, বাপকে চিনতে পারিস নে।

নির্মলা জামাইয়ের জন্য চা নিয়ে এলেন। বললেন, তারার বড় ন্যাওটা ওরা। রাতদিন কোলে কোলে থাকে। ছোটটি তো খাঞ্জে-খাঁ নবাব, এতটুকু মাটিতে নামালে পরিত্রাহি চেঁচানি। এমনি হয়েছে, তারাকে ছেড়ে ওরা মায়ের কোলে থাকে না।

নিরঞ্জন বলে, কেন থাকে না তা ওদের দুই বোনের চেহারা থেকে বুঝে দেখুন। নধর মাংসের গদি পেয়েছে, হাড়ের আঁটির চাপ সইতে যাবে কেন? বাচ্চা হলে কি হবে, আরাম বোঝে সবাই।

কথার ধরন নির্মলার ভাল লাগে না। বলতে যাচ্ছিলেন, এমন তো ছিল না আমার মেয়ে। করল কে তার এই দশা? রাগের ঝাঁঝে কথাগুলো মুখে এসে পড়েছিল, কিন্তু কিসে কি দাঁড়াবে এই সমস্ত ভেবে অনেক কষ্টে সামলে নিলেন।

সময় বুঝে এক সময় তারপরে বললেন, দুর্গাকে রেখে যাও বাবা।

ঐ তো শরীরের দশা। একলা একটা মানুষকে সৃষ্টিসংসার দেখতে হয়। তার উপরে তিনটে বাচ্চার ধকল সামলানো। এখানে থেকে কিছুদিন জিরান নিয়ে যাক। কিন্তু তুমি না বললে হবে না বাবা, আমাদের কথা ও কানে নেয় না।

নিরঞ্জন বলে, থাকা মুশকিল সত্যিই। সৎমা বেটি বিষপুঁটুল— আড়ে-হাতে লেগেছে। বলব কি মা, ঝাড়ের বাঁশগুলো অবধি চুরি করে কেটে বিক্রি করে দেয়। যাচ্ছেতাই বদনাম রটায় আমার নামে। এই বড় বড় মানকচু হয়েছিল, ভুঁয়ের সমান করে কেটে পাচার করে দিয়েছে। মাথায় আমার খুন চাপে এক এক সময়; ভাবি, মা বলে আর রেহাই করব না। তার উপরে, ও যদি এখানে পড়ে থাকে, আমার অংশের দালানের ইটগুলো খসিয়ে খসিয়ে নিয়ে যাবে।

তারপর একটু ভেবে বলে, এক কাজ হোক। তারাও না হয় চলুক আমাদের সঙ্গে। ছেলে তিনটে তো দেখতে পারবে, তাতেই অনেক সুরাহা।

নির্মলা দোমনা হলেন, গোপেশ্বরকে বললেন কথাটা। গোপেশ্বর ঘাড় নাড়েন। খনার দেওরের সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা হয়েছিল, সে সম্বন্ধ ফেঁসে গেছে। পাত্রপক্ষ দেরি করতে রাজি হলেন না, ইতিমধ্যেই ছেলের বিয়ে সেরে ফেলেছেন। যে উদ্দেশ্যে বিয়ে দেওয়া—হিন্দুস্থানে ঘরবাড়ি বানানো—বিয়ে অন্তে আর দেরি করেন নি, বউ নিয়ে সব সুদ্ধ তাঁরা ওদিকে গিয়ে উঠেছেন। তারারই যাবার কথা—কিন্তু কপাল দোষে ঘটে উঠল না। বড়গিন্নি মারা গিয়ে নাতনির অমন গাঁথা সম্বন্ধটা চুরমার করে দিয়ে গেলেন। তাই বলে অবশ্য গালে হাত দিয়ে বসে থাকলে হবে না, উঠে পড়ে লাগবেন আবার। হামেশাই মেয়ে দেখাতে হবে। এখন তারাকে বাড়িছাড়া করা যায় কেমন করে?

দুর্গারও ঘোরতর আপত্তি। বলে, বোন নিয়ে গিয়ে অমন সুখে কাজ নেই আমার! সুখ চেয়ে সোয়াস্তি ভাল মা। তিনটে বাচ্চার

ঝক্কি আছে, তার উপরে আবার তারা। ওই যে দেওর এসেছিল, পাজির পা-ঝাড়া ছোঁড়াটা। হাঁড়ি আলাদা হলে কি হবে, এক বাড়িতে থাকা ওদের সঙ্গে। হঠাৎ কোন রকম কেলেঙ্কারি ঘটিয়ে বসতে পারে।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে সভয়ে আবার বলে, আমি এই সমস্ত বলেছি, তোমার জামাইর কানে খবরদার না যায়। তা হলে রক্ষে রাখবে না মা। বিষম গোঁয়ার।

পাঁচারই চলে গেল দুর্গা। যাবার সময় বড্ড কান্নাকাটি করল। এর পর মেয়ে দুটোর ভাবনায় নির্মলা আর সোয়াস্তি পান না। বিধি যখন বাম হন, রাঁধা-কইমাছ খলবল করে জলে পালিয়ে যায়। তারার অমন সম্বন্ধটা হতে হতে হল না। নিরঞ্জনই বা কি ছিল আর কেমন হয়ে গেছে—দেখ ভেবে সেই কথাটা।

মিষ্টিমিঠাই খেয়ে গরু নিয়ে শ্মশানবন্ধু জবেদ সেই যে সেদিন বাড়ি ফিরে গেল। মাসখানেকের মধ্যে এর-ওর কাছে শুনতে পায়—গুরুতর ব্যাপার। হিন্দুর শ্মশানে গেছে, হুঁকো দেবে না আর কেউ জবেদকে, সমাজে একঘরে করবে। আখেজই করাচ্ছে বুঝতে পারা যায়। গোপেশ্বরের বাড়ির ব্যাপার, আক্রোশটা বেশি করে যেন সেই জন্যেই। এবং খুব সম্ভব আমেদ ডাক্তারও পিছনে থেকে এই মওকায় রোগি জোটানোর তালে রয়েছে। কিন্তু খুন করে ফেললেও জবেদ যাবে না আখেজের কাছে। অন্য যারা মাতব্বর আছে, তাদের বাড়ি বাড়ি কান্নাকাটি করে ঘোরে: গরু যে ওনাদের! রাখাল হয়ে আমি নিয়ে বেড়াই। গরুতে পিঠে করে ক'খানা কাঠ দিয়ে এসেছে, আমি কাঁধে বই নি, আমার গুনাহ্ তবে কিসে?

কিন্তু এসব ছেঁদো কৈফিয়ৎ কেউ বড় কানে নিতে চায় না। অঞ্চলটা ঘুরে দেখে এসো, মানুষ সব কী হয়ে গেছে! কত রকমের

শলাপরামর্শ চলেছে পাড়ার মধ্যে। বেহারারা পালকিতে আর কাঁধ দেবে না। গরুর গাড়িতেও মানুষ তোলা বারণ—বিশেষ করে হিঁদু-মানুষ। আমাদের মতন আছি আমরা, হিঁদুর কোন ব্যাপারে থাকব না আর কেউ।

শেষটা জবেদ বক্তার থাঁর কাছে গিয়ে পড়ল। গোপেশ্বরই বলে কয়ে পাঠালেন। গাঙ-পারের মানুষ বক্তার, এদের কেউ নন—জবরদস্ত মানুষ বলে খাতিরও আছে। তিনি এসে পড়ে ছোট-বড় সকলের খোশামুদি করে খাসি জবাই করে সকলকে দাওয়াত দিয়ে মিটমাট করে দিলেন। দশের মুকাবেলা নিজের কান নিজে মলল জবেদ, নাকে খত দিল।

শিক্ষাটা হল ভাল রকম। তারপরে জবেদ একদিন গোপেশ্বরের কাছে গিয়ে পড়েঃ রূপোকে নেয়ে নেন ডাক্তারবাবু। আর রাখতে পারব না। পরের গরু টেনে বেড়াই, পড়শিরা সকাল বিকেল গাল পাড়ছে। আবার কোন কাণ্ড ঘটিয়ে বসে!

গোপেশ্বর পিঁড়ি এগিয়ে দিলেনঃ বোসো জবেদ মিঞা। আমিও ভাবছিলাম তাই। গরুর একটা ফয়সালা হয়ে যাওয়া উচিত।

জবেদ অবাক। গোপেশ্বর ডাক্তারেব কাছে এতদূর খাতির—তুই থেকে তুমি হয়ে গেছে, পিঁড়ি এলো বসবার জন্যে—শলাপরামর্শ তবে শুধু মুসলমানের মধ্যে নয়, হিন্দুদের মধ্যেও হচ্ছে। নইলে এরকম হবে কেন? ছোট্ট বয়স থেকে এত বড়টা হল পাড়ার মধ্যে, খাতিরের চোটে আজকে তার দম বন্ধ হয়ে আসে।

গোপেশ্বর বললেন, গরু আমরা নেব না। সোনা যেমন আছে, রূপোও তেমনি তোমার। বেচতে হয় বেচ তুমি, রাখতে হয় রাখ। আমি কিছু জানি নে।

জবেদ জিভ কাটেঃ সে হয় না ডাক্তারবাবু। গিন্নিমা হুকুম

দিয়ে গেছেন। তারার গরু। পাঁচ টাকা দেওয়া আছে, আর কত্তই বা হবে। যখন সুবিধে হয় দিয়ে দেবেন, রূপোকে আমি এ বাড়ি বেঁধে রেখে যাচ্ছি।

গোপেশ্বর ধরা গলায় বলেন, যে রকম অবস্থা—কোনদিন হয়তো দেখবে, তারাকে এক হাতে তারার মাকে অন্য হাতে ধরে পথে বেরিয়ে পড়েছি। বাপ-পিতামহের এ জায়গা আর এখন আমার নয়। পড়শিদের মনের তল্লাশ পাওয়া যায় না। সমস্ত হঠাৎ কেমন অচেনা হয়ে পড়ল, সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকি। এর মধ্যে গরুর বখেড়া বাড়াব না; নতুন করে আর দায় জড়াব না। মনের কথা বলে ফেললাম জবেদ, দশ কান কোরো না।

জবেদ ফিরে গেল। অবস্থা বিবেচনার জেদাজেদি করাও চলে না।

মাস কয়েক পরে একদিন তারা বাপের কাছে নালিশ করছে: জবেদ চাচা গাড়ি আর লাঙল করেছে। আমার রূপোকেও গাড়িতে জুড়েছে। ভগবতীর কাঁধে জোয়াল চাপিয়ে দিয়েছে বাবা।

রূপো আর আমাদের নয়—

নির্মলাও সেখানে। গোপেশ্বর এদিক-ওদিক তাকিয়ে ফিসফিস করে বললেন, বাস তো তুলতেই হবে। আজ হোক আর দু-দিন পরে হোক। কখন কি ধুয়ো ওঠে—কান খাড়া করে কাঁহাতক এমন থাকা যায়। তুমিও কিন্তু সব জান না নিমু, বিলিব্যবস্থা করে ফেলেছি, এর পরে হয়তো সময় থাকবে না। রূপো, ওই শুনলে, জবেদ মিঞার। দালানকোঠা আখেজ গোলদারের। পুকুরটা জমির মুনসির। গোলার দরুন হাসান গাজি টাকা আগাম দিয়ে রেখেছে। কেউ কাকে বলছে না খদ্দের বাড়লে দর উঠে যাবে সেই ভয়ে। যে ক'টা দিন গাঁয়ে আছি, চোখ তুলে কেউ জিনিসের পানে তাকাবে না। সেই রকম চুক্তি। তারার বিয়ে অবধি মেয়াদ। বিয়েটা হয়ে যাক—অমনি দেখবে, তাসের ঘরের মতো ঠাটবাট ভেঙে পড়ছে;

সস্তায় পেয়ে এ-লোক এটা, ও-লোক ওটা হাতে তুলে নিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে যাচ্ছে। সদর-দরজা দিয়ে তারা শ্বশুরবাড়ি যাবে, আর খিড়কি-দরজা দিয়ে আমরাও চলে যাব—কোন চুলোয়, তা অবশ্য এখনো জানি নে।

গরু-খোঁজা বলে একটা কথা আছে গাঁ-অঞ্চলে। এড়া-কালে গরু-ছাগল ছেড়ে দেয়—একটা গরু হয়তো সন্ধ্যাবেলা ফিরল না, হাতে দড়ি নিয়ে সেই গরু খুঁজে খুঁজে বেড়ানো। বাড়ির আনাচ-কানাচ, উলুবন, গোরস্থান—কোন জায়গা বাদ নেই। সন্দেহ হলে পা টিপে টিপে এগিয়ে যাবে। এবং সত্যিই সেই হারানো গরু যদি হয়, শিঙ ধরে ফেলে টপ করে দড়ি পরিয়ে দেবে। আর হাঙ্গামা নেই—দড়ি ধরে গোয়ালে নিয়ে এসে ঘাস-বিচালির জাবনা দাও মুখে।

গোপেশ্বর তারার বিয়ের পাত্র খুঁজে বেড়াচ্ছেন তেমনি করে। উঠে পড়ে লেগেছেন। কোন-একটা খবর পেলেই হল—ছুটলেন সেখানে। আট-দশ দিনের মধ্যে আর পাত্তা নেই। অর্থাৎ সে জায়গায় সুবিধা হয় নি—আবার কোন সন্ধান পেয়ে চলে গেছেন অন্যত্র। সেখান থেকে হয়তো বা আর এক ভিন্ন জায়গায়। কিছুই হল না—ঝুটা খবর, মেয়ে দেবার মতো সম্বন্ধ একটাও নয়। মরীচিকার পিছনে ছুটাছুটি করা। ময়লা কাপড়চোপড় মলিন চেহারা আর রুক্ষ মেজাজে গালিগালাজ করতে করতে অবশেষে গোপেশ্বর বাড়ি ফেরেন।

নির্মলা বলেন, তোমার দ্বারা হবে না। বড্ড খুঁতখুঁতানি তোমার। অধিক যে বাছে, তার শাকে পোকা।

বাছাবাছি দেখলে কোথা? পাঁচ-দশটা থাকলে তবে তো তার মধ্যে বাছাবাছি! যত আজেবাজে খবর। পাত্র সব হাঁড়িকলসি —বিয়ের পাত্র একটাও নেই।

নির্মলা বলেন, পাত্র নেই তো বিয়েথাওয়া সব হচ্ছে কেমন করে?

এখন আর হচ্ছে কোথায়? আগে হত। সে হল পুরানো যুগের কথা। তখন ছেলে ছিল, মেয়ে ছিল। ঢোল-শানাই বাজত, হাসিমস্করা রঙ্গরস হত। যেমন হয়েছিল আমার দুর্গার বিয়েয়। পাত্রপাত্রী আর এখন এদেশে নেই, পার হয়ে চলে গেছে। কোন পুরুষে যাদের বিয়ের আশা ছিল না, মওকা পেয়ে তারাই সব গোঁফ চুমরে পণের দরাদরি করছে।

নির্মলা বলেন, আমরাও চল ওপারে গিয়ে উঠি। ভিটের মায়া করে পড়ে থাকলে হবে না।

গোপেশ্বর হতাশ কণ্ঠে বলেন, যাব তো বটেই। আজ না হয়, কাল। সোজা মানুষ যে আমি—আগে থেকে কোন-কিছু ভাবি নি। জীবন ভোর যা-কিছু করলাম, সমস্ত এই একখানা গাঁয়ের এলাকায়। ওদিকে গিয়ে উঠি কোথা এখন? আর গলার পাথর হয়েছে সেয়ানা মেয়ে—হুট করে যেখানে সেখানে উঠে পড়া যায় না।

গোপেশ্বরের মতন উদ্বেগ সকলেরই। গোপনে গোপনে সরে যাবার তালে আছে। যেদিকটা হিন্দুস্থান হবে বলে শোনা যাচ্ছে, উদ্যোগী কেউ কেউ ইতিমধ্যেই চলে গেছে সেখানে। যেমন ওই খনার শ্বশুর। গোপেশ্বরও চুপিসারে গিয়ে একটা জায়গা দেখে এলেন। ঠিক জায়গাটা এখন অবশ্য দেখবার উপায় নেই, যাওয়া যায় না সেখানটা। ঝসাড় বেতবাগান, বুনোশুয়োরের আস্তানা। তবে এ অবস্থা থাকবে না—জঙ্গল কেটে সাফসাফাই হবে, রাস্তা বেরুবে, ঘরবাড়ি হবে, দোকান-বাজার-ইস্কুল বসবে। কাগজের উপর নক্সা এঁকে রেখেছে, তাই দেখে দরদাম করে এলেন গোপেশ্বর। ঐ কাগজ দেখে প্লট কিনছে লোকে। গোপেশ্বর কিন্তু দোমনা হয়ে ফিরলেন। জমি বিক্রি হয়ে টাকা পেয়ে যাবার পর মালিক হাত গুটিয়ে আছে, এমনি দৃষ্টান্ত আশেপাশে অনেকগুলো দেখলেন। একেবারে তৈরি জায়গা পাওয়া খুব মুশকিল—হয় খদ্দেরের

কিনে ফেলেছে, নয় তো কিনতে পারছে না মালিক অসম্ভব দাম হাঁকছে বলে। দাঁও পেয়ে গেছে—ছাড়বেই বা কেন? মোটের উপর দুটো কাজ নিয়ে গোপেশ্বর পড়েছেন—মেয়ের বিয়ে এবং গ্রাম থেকে সরে পড়বার ব্যবস্থা। কোনটাই হয়ে ওঠে না। নির্মলার কাছে এই নিয়ে গঞ্জনার অন্ত নেই।

নির্মলা বলেন, যা হোক একটা জায়গা নিয়ে ঘর তুলে ফেল তুমি। সেইটে আগে। ভাল পাত্তোর পার হয়ে চলে গেছে তো বিয়ে ওদিকে গিয়ে হবে।

গোপেশ্বর বলেন, সোমত্ত মেয়ে নিয়ে পথে বেরিয়ে কত কাণ্ডবাণ্ড হচ্ছে শুনতে পাও না? কাঁধের বোঝা না নামিয়ে নড়ব না, সে তুমি যাই বল। গো-মড়কে শকুনের পার্বন—শকুনেরা পথে পথে ওৎ পেতে রয়েছে।

নির্মলা আর কিছু বলেন না। কত কথা কানে আসে ইদানীং—যত শোনেন বুকের মধ্যে কাঁপে। বাপের বাড়ি কাছাকাছি গাঁয়ে—এতখানি বয়স অবধি শুধুমাত্র কয়েকটা গ্রামের মধ্যেই চলাচল করে এসেছেন। এই চেনা গণ্ডির বাইরে অকূল সমুদ্র। আজকে চারিদিকে উড়ু-উড়ু অবস্থা, বাইরের নিরাপদ জায়গার খবরাখবর নিচ্ছে লোকে, সত্য মিথ্যা নানারকম রটনা। নির্মলা পঞ্চাননতলায় মাথা কোটেন: সুরাহা করে দাও ঠাকুর, তারার একটা ভাল সম্বন্ধ এনে দাও। তার পরে আমাদের ভাগ্যে যা হয় হোক।

হঠাৎ দুর্গার চিঠি পেয়ে গোপেশ্বর পাঁচারই ছুটলেন। লিখেছে, ভাল পাত্র আছে, চলে এসো।

বাপের কাছে কেঁদে পড়ল দুর্গা: আমি আর বাঁচব না বাবা—

বহুদর্শী চিকিৎসক গোপেশ্বর। কত রোগি দেখেছেন, কিন্তু জীবন্ত মানুষের এমনি চেহারা এই বুঝি প্রথম দেখছেন। মনের মধ্যে হায়-হায় করে ওঠে। বড়গিন্নির শ্রাদ্ধের সময় দুর্গা গিয়েছিল। তখনও

যা ছিল, এখন তার সিকিখানা। অল্প অল্প জ্বর হয়, নানান রকম উপসর্গ। উঠে দাঁড়ালে মাথা ঘোরে। থাক এখন, সবিস্তারে পরে শোনা যাবে—

জামাই কোথায় রে?

দুর্গা বলে, আজ একমাসের উপর বাড়ি মুখো হয় নি। বলে, কাঁহাতক মড়া আগলে থাকি। তার চেয়ে সদরে দশ কাজের মধ্যে কেটে যায় ভাল। যা শুনছি তো বুক শুকিয়ে যায়। জমাজমি বেচে কিছু টাকা ব্যাঙ্কে রেখেছিল, ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নাকি দু-হাতে খরচ করছে। কি হবে বাবা?

হাউহাউ করে সে কেঁদে ওঠে। বলে, আমার যা হবার হোক। ক' দিনই বা আছি বেঁচে! আমি কিছু ডরাই নে। কিন্তু বাচ্ছা তিনটের কি হবে? আমার মরা পর্যন্ত হয়তো সবুর সইবে না, তার আগেই কেলেঙ্কারি ঘটিয়ে বসবে।

স্বপ্নে যা কখনো ভাবা যায় নি, তাই কেমন ঘটে যাচ্ছে। যেদিকে তাকানো যায়, ভেঙে পড়ছে যেন সমস্ত। বড়গিন্নি থাকলে বলতেন, কলির চার-পো পুরল এইবারে। সভ্যভব্য মানুষ আর নেই, জন্তু-জানোয়ারের কামড়াকামড়ি। ভাল ঘর-বরে দুর্গার বিয়ে দিয়ে ভাবলেন, ষোলআনা নিশ্চিন্ত মেয়েটার সম্পর্কে। সেই দুর্গা কি বলে শোন। গোপেশ্বর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত শুনলেন। আর একদিন ভাসা-ভাসা বলেছিল—বলবার কথাও নয় ভিন্ন লোকের কাছে। বাপ হলেও নয়। কিন্তু জীবন-মরণ সঙ্কটের মধ্যে এখন আর না বলে কি করে? কাঁপছে উত্তেজনায়। মেয়ে যেন একখানা তেজপাতা। অমন গৌরবর্ণ শুকিয়ে তেজপাতার মতন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ঝড়ঝাপটার মধ্যে পাতার মতো কাঁপছে। ফিট হয়ে না পড়ে যায়।

গোপেশ্বর বললেন, আমার সঙ্গে চল। শরীরের এই অবস্থায় একা একা এখানে থাকবি কেমন করে?

দুর্গা বলল, গেলে আর ফিরতে হবে না। সেইটেই চাচ্ছে ও। একটা কোন অজুহাত পেলে এই বাড়িতে আর-একটাকে এনে তুলতে পারে। আমি হাজির থাকতে সেটা হবে না। চাচ্ছে যে আমি মরে যাই, কিম্বা চলে যাই অন্য কোথাও।

গোপেশ্বর নিজ সংসারের কথাও ভাবছেন—আপনি শুতে ঠাঁই পায় না শঙ্করাকে ডাকে। তারার বিয়ে চুকিয়ে দায়মুক্ত হয়ে ছুটে পালাবার তালে আছেন, এমন অস্থিত্ত-পঞ্চক অবস্থায় জীবন্মৃত মেয়ে আর অপোগণ্ড তিন শিশু কায়েমি ভাবে নিয়ে তোলেন এখন কোন ভরসায়?

বললেন, নিরঞ্জন তো ওপারে জায়গাজমি দেখছিল। আমায় বলল সেবারে।

দুর্গা বলে, আমিই হতে দিচ্ছি নে বাবা। হতে দেব না। এখানে তবু জ্ঞাতগুষ্ঠির মধ্যে আছি। খবর দিলে তোমরাও এসে পড়বে। এলাকার বাইরে চলে গিয়ে তখন কোন মূর্তি ধরে, ভরসা করতে পারি নে।

গোপেশ্বরের ছাঁৎ করে পুরানো দিনের কথা মনে আসে। পুরানো মানে পাচটা কি ছ'টা বছর। বিয়ের পরে সেই ছলাকলা দু'জনের—পালিয়ে মেলার ভিড়ে গিয়ে মেলামেশা, আত্মীয়জনের মনে ধাঁধা লাগানো। হায় মানুষ!

দুর্গা হঠাৎ বলে ওঠে, তারার বিয়ের জন্য পাগল হয়ে বেড়াচ্ছ, বিয়ে এইখানে দাও না বাবা।

গোপেশ্বর সাগ্রহে বলেন, এইখানে—ভাল পাত্তোর আছে পাঁচারইয়ে?

দুর্গা বলে, তোমার জামাই আছে। তার চেয়ে ভাল পাত্তোর পাবে কোথা?

দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে বাপের দিকে। বলে, কথাটা ভেবে

দেখ বাবা। একটামাত্র খুঁত, আমি আছি সতীন হয়ে। কিন্তু আমি আর ক'দিন? যদি বল তিনটে বাচ্চা ছেলে—তারা যেমন ওদের ভালবাসে, ছেলেগুলোও তেমনি ভালবাসে তারাকে। অত টান আমার উপরেও নয়। মাসির জায়গায় মা হয়ে এসে তারা দেখো খুশিই হবে।

কথা শুনে গোপেশ্বর স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। বললেন, যা বললি বললি। আজেবাজে কথা কক্ষণো আর মুখে আনবি নে। মানা করে দিচ্ছি।

দুর্গা শান্ত কণ্ঠে বলে, না বাবা, বলতে হবে মন্দটা কিসে? আমি যদি মরে যেতাম, উৎকৃষ্ট সম্বন্ধ বলে লুফে নিতে তোমরা। তখন কোন আপত্তির কথা উঠত না।

গোপেশ্বর বলেন, কোনটা হলে কি হত তোর কাছে শুনতে চাচ্ছি নে তো! চুপ কর, তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

ম্লান হেসে দুর্গা বলে, খারাপ হবার হলে অনেক দিন আগে হয়ে যেত। কেউ সেজন্য দোষ দিতে পারতে না। মাথা খুব ভাল আছে বলেই যত দুর্ভাবনা। পনের আনা মরে রয়েছি বাবা। পুরোপুরি পারছি নে শুধু ঐ ছেলে তিনটের মুখ চেয়ে। এখানে আবার বিয়ে দেবে, কথা দাও—গলায় দড়ি দিয়ে কি পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে নিশ্চিন্তে আমি মরব। বেঁচে থাকার যে কষ্ট, মরা অনেক সুখের তার চেয়ে।

আবার বলে, অনেক দিন ধরে অনেক রকমে ভেবেছি বাবা। এক কথায় কেটে দিও না। বাড়ি গিয়ে মায়ের সঙ্গে বল। এই একমাত্র পথ, যাতে সর্বরক্ষে হবে। তোমার জামাইয়েরও ভারি পছন্দ তারাকে। আমার কাছে স্পষ্ট বলেছে। আমাদের দুই বোনে তুলনা করে। আমি হলাম হাড়-মটমটি ঘাটের মড়া; তারা হল নাদুসনুদুস, স্ফূর্তির মেয়ে—লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করে বেড়ায়।

গোপেশ্বর চিন্তান্বিত মনে বাড়ি ফিরলেন। দুর্গাকে দেখলেন, আর মায়ের শ্রাদ্ধের পরে নিরঞ্জন সেই গিয়েছিল। বিয়ের সময়টা জামাই-এর পাতলা-পাতলা চেহারা ছিল, এখন দিনকে-দিন দশাসই দৈত্য হয়ে উঠেছে। ডাক্তার মানুষ, বুঝতে পারেন সব। ষোলআনা দোষও দেওয়া যায় না নিরঞ্জনকে। কোন স্বাস্থ্যবতীকে বিয়ে করলে ঘরে আবার মন বসবে, এমনধারা উড়ুন-চড়ুই বাউণ্ডুলে হয়ে বেড়াবে না—অনুমানটা একেবারে অহেতুক নয়। সমস্ত পথ ভাবতে ভাবতে এসেছেন গোপেশ্বর। মন বড় খারাপ।

আরও কিছুকাল গেল টালবাহানায়। গ্রামের উপরে সাংঘাতিক কাণ্ড। এক মুসলমান দারোগার ছেলে মলিনাকে ধরে নিয়ে বিয়ে করে ফেলেছে। ও-পাড়ার ব্রতীনের বোন মলিনা। বিষম উত্তেজনা গোটা অঞ্চল জুড়ে। নিরঞ্জনের বাপ খুন হয়ে গেলে তখন একবার হয়েছিল, আর এই। এটা আরও ভয়ানক। দেখছ কি, এই চলল এখন একের পর এক। মেয়েছেলে নিয়ে শান্তিতে ঘরবসত করতে দেবে না, ধরে ধরে নিয়ে যাবে। একটি-দুটি করে আগে থেকেই সরছিল—এবারের এই ঘটনার পর হিন্দুবাড়িগুলো প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল। সোমত্ত মেয়ে বড় একটা নেই—পিসিমা মাসিমা দিদিমা এমনি ধরনের বুড়োহাবড়া কেউ কেউ ভিটেয় প্রদীপ দেবার জন্য রয়ে গেছেন।

দারোগার ছেলেটাকে ধরে চালান দিয়েছে। মামলা চলবে, কিন্তু গোড়াতেই গোলমাল ঘটাল মলিনা। কোর্টে দাঁড়িয়ে হাকিমের মুখের উপর বলে, ভালবেসে স্বেচ্ছায় নাকি এই বিয়ে করেছে। আরে, বলে কি আর সাধে? যেমন বলাচ্ছে—তোতার মতন শেখানো কথা টরটর করে বলে যেতে হয়। সাবালিকা মলিনা—বয়স পঁচিশের উপর, কালোকুচ্ছিৎ বলেই বিয়ে দিতে পারে নি এতদিন। মামলার তদ্বিরে গিয়ে ব্রতীন হাত কামড়ানো ছাড়া উপায় দেখতে পায় না।

চুলোয় যাকগে মলিনা। দোষ তার বাপ-ভাইয়ের—যাকে সর্ষের তেল দিয়ে যারা ঘুমোয়। সে রকম চেষ্টা করলে বিয়ে কি আর আটকে থাকত? পরিবার গত হয়ে কত মানুষ ছেলেপিলের জঞ্জাল নিয়ে হিমসিম হচ্ছে—লুফে নিত তারা মলিনাকে। সে কথা যাক, কিন্তু তারার বিয়ের ব্যাপারে এর পরে তিলার্ধ আর গড়িমসি নয়। হোক বিয়ে নিরঞ্জনের সঙ্গে। জনশূন্য গ্রামে ধুবড়ো মেয়ে বিষম ভারবোঝা হয়ে উঠেছে—এক একটা দিন যায়, ভার আরও বাড়ে। সন্ধ্যা হতে না হতে ঘরের দরজা-জানলায় খিল আঁটেন। একটা ইঁদুর নড়লে ঘুম ভেঙে উঠে থরথর করে কাঁপেন নির্মলা আর গোপেশ্বর। এমন করে থাকা যায় না। পাঁচারই অনেক ভাল এখানকার তুলনায়; সে গ্রাম এখনো এতদূর ফাঁকা হয়ে যায় নি। তা ছাড়া তারার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেলে, দুর্গার বাইরের ভয় ঘুচবে, তখন ওপারে গিয়ে বাড়ি তোলবার ব্যবস্থায় সে বাধা দেবে না। দুর্গা বলেছে, বিয়ের আগে নিজে সে বাপের বাড়ি চলে আসবে, উদ্যোগ-আয়োজন করে দাঁড়িয়ে থেকে বোনের সঙ্গে বিয়ে দেবে। বিয়ে দেবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। কিন্তু অতখানি হতে দেওয়া ঠিক নয়, গোপেশ্বর তাকে নিরস্ত করলেন। শরীরের ওই অবস্থায় এত টানাপোড়েন সহ্য হবে না। তা ছাড়া গাঁয়ের পড়শি যে দু-চার জন এখনো আছে, তারা হাসাহাসি করবে এই নিয়ে, দুর্গার খারাপ লাগবে। কাজ কি গাল বাড়িয়ে চড় খেতে আসবার? পাঁচারইর বাড়ি থেকে ছোট বোনকে সতীন রূপে ঘরে নিয়ে তুলবে—সেই তো অনেক।

*

বিয়ের তারিখ এসে যায়। হরনাথ বেঁচে নেই, যত কিছু কথাবার্তা এখন মাতুল নন্দলালের সঙ্গে। তিনি বললেন, শুনুন ডাক্তারবাবু, নিরঞ্জন জানিয়ে দিয়েছে—বরসজ্জা বলুন মেয়ের গয়নাগাঁটি বলুন কোন-কিছুর দরকার নেই। নিতান্ত যেটুকু নইলে রীতরক্ষা হয় না।

আগের বিয়েয় আপনারা বিস্তর দিয়েছিলেন, সেই সব জিনিসের কি গতি হবে এখন তাই সমস্যা। আপনার আর বেহান ঠাকরুনের মনে কষ্ট হবে অবিশ্যি—বড় মেয়েও মেয়ে, ছোট মেয়েও মেয়ে। কোল-মোছা সন্তানের উপর মায়ের টানটা আরও বেশি হয়। কিন্তু উপায় নেই, যখনকার যে হাল। যা-কিছু দিতে চান, আপনি যখন সম্পূর্ণ নগদ করে দেবেন। দরকার মতন যা গাঁটে নিয়ে বেরিয়ে পড়া চলে। অথবা হুণ্ডি করে পাঠানো যায়।

গোপেশ্বর নিশ্বাস ফেললেন: তাই হবে যেমনটা বললেন। কত সাধ ছিল তারার বিয়ে নিয়ে! আমাদের ছিল, আমার মার অনেক বেশি ছিল। উপর থেকে তিনি ছোট-নাতনির বিয়ে দেখবেন—ন্যাড়া গায়ে তারাকে আমরা শ্বশুরবাড়ি পাঠাচ্ছি বোন-সতীনের ঘর করতে।

হাত ধরে নন্দলালকে গোপেশ্বর ভিতরে নিয়ে গেলেন। হাঙরমুখো-পায়া অতিকায় এক সেকেলে খাট দেখিয়ে বলেন, এই খাট আমার মা এনেছিলেন বাপের বাড়ি থেকে। পাথরের মতো শক্ত কাঠ, কোন দিন কিছু হবে না। তারা ছিল তাঁর বড় পেয়ারের। বলতেন, এ খাট তারাকে দিলাম, তারা শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাবে। আ[illegible]যেরই কি-হয় কি-হয় অবস্থা, তার খাট! আখেঞ্জ গোলদারকে জিজ্ঞাসা করব, খাটের তার দরকার আছে কিনা। তার ঘরে চলে যাবে, নয়তো অন্য কোথাও। সমস্ত যাবে। মানুষ ক'টাই বা ক'দিন থাকে দেখুন।

নন্দলাল বলেন, বরযাত্রী কি রকম নিয়ে আসব তারও একটা আন্দাজ চাই ডাক্তারবাবু। আপনার বড় মেয়ের বিয়েয়—সে তো রাজসূয় ব্যাপার! অত মানুষ কোথায় এখন, সেই স্ফূর্তিই বা কোথায় মানুষের মনে! মামা-ভাগনেয় আমাদের তাই কথা হচ্ছিল, এই বাজারে একগাদা মানুষ জুটিয়ে কুটুম্বকে মুশকিলে ফেলা উচিত হবে না।

গোপেশ্বর দরাজভাবে বললেন, মুশকিল কিছু নয়। বরযাত্রী যদ্দূর

পারেন নিয়ে আসবেন বেহাই মশায়। আঁটসাঁটি করবেন না। খিড়কি-পুকুর আর বিলের পুকুর—দুটো পুকুর ভরা মাছ। সমস্ত তুলে ফেলব। আমার এই শেষ কাজ, এ বাড়ির শেষ আমোদআহ্লাদ—কার জন্যে আর রাখতে যাব? রাখলে তো বারো ভূতে লুটেপুটে খাবে। তারার বিয়েয় আমাদের একটা সাধ অন্তত মিটুক—মানুষজনের পাতে চাট্টি ভাত দিই। এত হাঙ্গামার বিয়ে—দশজনে তবু উঠানের উপর এসে আমার তারাকে আশীর্বাদ করে যান।

পাশাপাশি সাতখানা গ্রাম নিয়ে সমাজ। কিন্তু খুব বড় ক্রিয়া-কর্ম ছাড়া নিজ গ্রামের বাইরে বড় কেউ যায় না। ছোট মেয়ের বিয়েয় গোপেশ্বর সাত গ্রামের ষোলআনা সমাজ ডেকে বসলেন। সমাজ ডাকতে অসুবিধা নেই। বেশির ভাগ লোক চলে গেছে। যারা আছে, কবে কোন দিকে পালাবে সেই ভাবনায় ব্যাকুল—সভা-শোভন করে নিমন্ত্রণ খাবার পুলক কারও নেই। সমাজ-সামাজিকতা ভেঙে পড়েছে। সাতখানা গ্রাম মিলে জনসত্তর হয় কিনা তাই দেখ। আর ওই যে বরযাত্রী জুটিয়ে আনার কথা হল—নন্দলাল পাঁচারই চলে গেছেন—বিয়ের আগের দিন তাঁর চিঠি এলো, বরযাত্রী বারো-চোদ্দজন আসে [illegible]সাকুল্যে। মানুষ কোথায় যে আসবে? আর আসবেই বা কেমন করে? পাঁচারই থেকে রেলে এসে স্টেশনে নামবে—সেখান থেকে আড়াই ক্রোশ পথ। সমস্ত বেহারাপাড়াটা ঘোরাঘুরি করে দু-টাকার জায়গায় দশটাকা কবুল করেও শুধুমাত্র বরের জন্য একটা পালকি জোটানো গেল না। অথচ খান দশেক পালকি গিয়েছিল দুর্গার বিয়ের দিনে। আর পাচ-সাতখানা গরুর গাড়ি। বরযাত্রীরা কেউ পায়ে হাঁটে নি। গাড়ি-পালকির মস্ত এক মিছিল—চোখ তাকিয়ে দেখবার বস্তু। আর এবারে দেখ, বর পায়ে হেঁটে বিয়ে করতে আসে—কোন পুরুষে যা কেউ শোনে নি। বর নইলে বিয়ে হয় না—তাকে আসতেই হবে যেমন করে হোক

উঠান জুড়ে সামিয়ানা খাটানো। কলাগাছ কেটে দু-মাথা সমান করে বসিয়ে দিয়েছে মাঝে মাঝে। তার উপরে মেটে-সরায় তুষ-কেরোসিন দিয়ে আগুন ধরাল। ভোজসভায় আলো। সাত গাঁয়ের মানুষ ডেকেও একটা উঠান ভরানো গেল না। পাল্লাপাল্লি হচ্ছে কে কত খেতে পারে—কেউ খেল দেড়-কুড়ি মাছ, কেউ দু-কুড়ি রসগোল্লা। দেবেন না—উঁহুঁ, একটাও নয়, আর পেরে উঠব না। কেবা শোনে কার কথা? পারতেই হবে—বেশি নয়, চারটে রসগোল্লা—বোঝার উপরে শাকের আঁটি। দাও হে—কি দেখছ? গোপেশ্বর ডাক্তার পরিবেশকের সঙ্গে নিজে লাইনে লাইনে ঘুরছেন—পাতা খালি হয়েছে দেখলে রক্ষে নেই, ঢেলে দেবেন অমনি এক গাদা। ওরই মধ্যে দরদালানে ঢুকে নির্মলাকে বলেন, বাইরে এসে দেখে যাও নিমু। কাঁটাঝিটকের জঙ্গল হবে উঠানে, দিনে-দুপুরে শিয়াল ঘুরবে, তার আগে তোমার গোবর-নিকানো উঠানের উপর কত মানুষ পাত পেড়ে খাচ্ছেন, দেখ একবার।

নির্মলা ম্লান মুখে বলেন, পাহাড়প্রমাণ এনে জুটিয়েছ, যতই খাক কত জিনিস বরবাদ হবে দেখো। তোমার কোন রকম হিসেবপত্তোর নেই।

বাঁশবাগানটা ছাড়িয়ে জবেদের বাড়ির কাঁঠাল-ত[illegible]ামিনুর ঠোঁট ফুলিয়ে আছে : তারার সাদি হচ্ছে, এত আলো [illegible] তারাদের বাড়ি, এত মানুষের আনাগোনা—আমায় একটিবার যেতে বলল না। আর কথা বলব না তারার সঙ্গে, কোন দিনও না।

জবেদ বলে, আমাদের কেন দাওয়াত করবে? আমরা মোছলমান। আর করলেই বা হিঁদুর বাড়ি যাব কেন?

অবোধ চোখ দুটি মেলে নুর বলে, মোছলমান কি আব্বা?

জাত।

আর, হিঁদু?

সে-ও জাত।

জাতের ব্যাপারটা মাথায় ঢোকে না ছেলের। বড় বড় মাছ তুলল পুকুর থেকে, ভিয়েন হল বাড়িতে—কত রকমের মিষ্টি-মিঠাই, এত মানুষ খাচ্ছেদাচ্ছে। কোন জাত এসে পথ আটকে দাঁড়িয়েছে—নুরকে বিয়েবাড়ি যেতে দিল না।

হাটখোলায় জারিগান—জবেদ গান শুনতে যাচ্ছে। নুরকে বলে, যাবি ?

নুর ঘাড় নাড়ল। গান শুনতে আজ মন নেই।

বাপ চলে গেছে, কথাগুলো তখনও ঘুরছে নুরের মাথার মধ্যে। দুর্গার সাদি হয়েছিল, সেই কথা মনে পড়ে। আমিনুর অনেক ছোট তখন। আয়েসাকে বলে, সেবারে তো দাওয়াত হল আমাদের! আমরা ডাক্তারবাড়ি গেলাম। আব্বা গেল, আমি গেলাম, তুমিও গেলে আম্মা —

আয়েসা সংক্ষেপে বলে, তখন হিঁদু-মোছলমান হয় নি এমনধারা।

মার সঙ্গে নুর শুয়ে পড়েছে। ঘুম আসে না আজ কিছুতে। সাদির দিনে বর-বউ ভারি সাজগোজ করে, মাথায় মুকুট পরে যাত্রা-গানের মতন। সাজগোজ করে তারাকে কী রকম দেখাচ্ছে না জানি! টিপে টিপে নুর বাইরে এলো। আয়েসা ঘুমিয়ে পড়েছে, টের পায় না। জ্যোৎস্না ফুটফুট করছে, ঠিক যেন দিনমান। ভোজের পরে মানুষ ঢেঁকুর তুলে গল্প করতে করতে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। রান্নাবান্না চমৎকার, আয়োজন অঢেল—এই সমস্ত কথাবার্তা।

তখন এক মতলব আসে নুরের মাথায়। সোনা-রূপো কি দোষ করেছে, তারা গিয়ে খেয়ে আসুক। ডাংপিঠে সোনা, সে যাবে আগে। গতিক বুঝে নিয়ে তারপর রূপোকে ছাড়বে।

বিয়েবাড়ি ঠাণ্ডা। উচ্ছিষ্ট কলাপাতার কাঁড়ি ঘরের কানাচে ফেলে দিয়েছে। সোনাকে বুঝিয়ে দিতে হয় না খাওয়ার বস্তু কোথায়

কোনদিকে। গন্ধ শুঁকে টের পায়। পাতার সঙ্গে দই লেগে আছে, লুচি আছে। আধেক-খাওয়া সন্দেশ-রসগোল্লা, মাছের কাঁটাকুটিও কত। একদিন তারা বড্ড দেমাক করেছিলি : ভগবতীর অংশ গরু শুধু নিরামিষ খায়। আজকে তো সেজেগুজে রাজরাণী হয়ে আছিস—চোখ মেলে একবার দেখে যা, গরু কি রকম রাক্ষস হয়ে গবগব করে গিলছে।

বাসরঘরে তখন তারা। বাসর শুধু নামেই। এপাড়া-ওপাড়া কুড়িয়ে জন পাঁচেক মেয়ে জোটানো গিয়েছিল। মলিনার ব্যাপারের পর থেকে বেলা ডুবলে কোন মেয়েলোক বাড়ির বার হয় না। তা সে যে-বয়সেরই হোক। নেহাৎ গোপেশ্বরের বাড়ির কাজ বলে আজকে এসেছিল। ডাক্তার মানুষের সঙ্গে খাতির রেখে চলতে হয়। রোগে-শোকে কত দিন গোপেশ্বর ডাক্তার গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন—তার জন্য কৃতজ্ঞতা আছে সকলের। তা ছাড়া শেষ কাজ এই গ্রামের—সর্বশেষ উৎসব। তাই এসেছিল ক'বাড়ি থেকে কয়েকটা মেয়ে—সকাল সকাল রীতকর্ম সেরে খেয়েদেয়ে তারা চলে গেছে। গেছে চলে আগে-পিছে হ্যারিকেন এবং দশ-বারোজন বেটাছেলে নিয়ে।

নিঝুম এখন পুবের দালান। কুলুঙ্গিতে পিলসুজের উপর প্রদীপ—মাটির প্রদীপে এক সঙ্গে চার-পাঁচটা সলতে জ্বালিয়ে দিয়েছে। বাসরের আলো নিভে গেলে অলক্ষণ।

নিরঞ্জন বলে, এক কাজ কর তারা। হুঁকোটা নিয়ে আয় দিকি শ্বশুর মশায়ের ঘর থেকে। নতুন জামাই নই রে বাপু, এইঘরেই আর একবার বাসর করে গেছি। তখন কলেজে পড়তাম, সিগারেটেই মউজ হত। এখন হুঁকো-কলকে। চট করে নিয়ে আসবি। এক গাদা মন্তোর পড়ে গলাটা বড্ড খুসখুস করছে।

আগুন দিয়ে আনবি কলকের। নিজে না পারিস অন্য কাউকে বলে আয়।

শুতে যাবার আগে খাটের প্রান্তে খালি গায়ে পা ঝুলিয়ে বসে নিরঞ্জন ফড়ফড় করে হুঁকো টানছে। প্রদীপের আলো আর তামাকের ধোঁয়ায় আবছা এক চেহারা খুলেছে—তারা একদৃষ্টে চেয়ে আছে। বড় একটা সুখটান দিয়ে নিরঞ্জনের নজরে পড়ল।

কি দেখছিস রে?

নিরঞ্জনের বড় বড় চোখের দৃষ্টিতে তারার ভয় করত। সেই চোখ দুটো আজ কোন গর্তের ভিতর ডুবে আছে, ঠাহর করা যায় না। কণ্ঠার উপরে একটা ডেলা খুব প্রকট—তামাক টানার সময় সেই ডেলা উপরমুখো ওঠে, আবার নেমে যায়। মজা লাগে এই তামাক খাওয়া দেখতে।

নিরঞ্জন বলে, হাঁ করে মুখের পানে চেয়ে দেখছিস কি ওরে শালী?

শালী হল পুরানো সম্বন্ধ—বউকে সেই নামে ডেকে রসিকতা হচ্ছে। হেঁ-হেঁ-হেঁ করে সে হেসে উঠল, হাসির তোড়ে ভুঁড়িতে দোলা লাগে।

তারা বলে, উঃ, তখন কত রকমের মজা করতেন জামাইবাবু! কত সব চালাকি মাথায়! মানুষকে শুনিয়ে শুনিয়ে আজেবাজে কথা বলা। আমাদের বাড়ি এক রকম চিঠি, আয়েসা চাচির বাড়ি অন্য রকম। এখন আর হবে না। আমরা চাচির বাড়ি যাই নে, ওরাও আসে না।

অনেক কাণ্ড করা গেছে—হ্যাঁ! মনে পড়ে যায় নিরঞ্জনের। মনে পড়ে আবার হাসল এক চোট। বলে, তখন যে কলকাতায় থাকতাম। ফুর্তির প্রাণ গড়ের মাঠ! হেঁ-হেঁ-হেঁ—

তারা বলে, কেমন সুন্দর ছিলেন আপনি জামাইবাবু—

কলেজে পড়তাম তখন। ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরি, গালের উপর ক্ষুর ঘষি হররোজ, ক্রিম মাখি। যেন সে কোন যুগের কথা। কলকাতায় গিয়ে আজকে বোধহয় পথঘাটই চিনতে পারব না। এমনিই হয়।

একটু যেন উন্মনা হল নিরঞ্জন। বলে, তোদের এই পুবের দালানটাও কেমন সুন্দর ছিল তারা। ধবধবে চুনকাম-করা। বালির জমাট খসে গিয়ে ইটগুলো দাঁত বের করেছে এখন। এই ভাল, বুঝলি?' যার যে মূর্তি, বেরিয়ে গেছে। পলস্তারা-ঢাকা চেহারা আমি পছন্দ করি নে।

খপ করে তারার হাত এঁটে ধরেঃ সেই পয়লা দিন থেকেই তোর উপরে মন পড়েছিল। এখনো তুই 'জামাইবাবু' কাকে বলিস ওরে শালী? শালী ছিলি, বউ হয়ে গেলি যে আজ। আয়—

তারা এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে জানলার দিকে গেল।

কি রে?

ফিসফিস করে তারা বলে, রোসো, পাতান দিচ্ছে বাইরে কে যেন।

জানলার কবাট ভেঙে পড়েছে, ছ্যাঁচা-বাঁশের বেড়ায় ঢাকা জায়গাটুকু। বেড়ার কাছে খড়খড় করে উঠল, কে এসে দাঁড়িয়েছে ওপাশে। ঠাকু-মার বড্ড পুলক ছিল, তিনি থাকলে আজ ঠিক আসতেন। দুর্গার বাসরেও লুকিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। মেয়েলোক সবাই কতক্ষণ আগে চলে গেছে। কেউ নেই। কে দেখছে তবে বেড়ার গায়ে চোখ রেখে? এই রঙ্গের বিয়ে—কোন মজা আছে আড়ি পেতে দেখবার?

সন্তর্পণে তারা উঁকিঝুঁকি দেয়। দরজা একটুখানি ফাঁক করে দেখে নিল একবার। বরের খাবার দিয়ে গিয়েছে—যেমনটা ঐ ভোজের ব্যাপারে, এক বরের জন্য পাক্কা তিন বরের মতন খাবার—বেশির ভাগই তার পড়ে রয়েছে। তারা মিষ্টি নিল কয়েকটা আঁচলের তলায়।

তারপরে, কি দরকারে যেন বাইরে যাচ্ছে—দ্রুত গিয়ে পিছন থেকে আমিনুরের হাত এঁটে ধরল।

চোর!

নুর বেকুব হয়ে গেছে। বলে, সোনাকে ধরতে এসেছি। ভারি বজ্জাত, বড্ড পেটুক। খাওয়ার লোভে গোয়াল থেকে পালিয়ে এসেছে।

দুটো সন্দেশ নুরের হাতে গুঁজে দিয়ে তারা বলে, খা—না খাস তো বিষ্টের কিরে। আমার মাথা খাবি নুর, আমার মরা-মুখ দেখবি।

উঁহু, আমরা মোছলমান, তোমরা হিঁদু। খেতে নেই যে, খাই কেমন করে?

কী রকম করে হাসে ঐ দেখ আমিনুর। বলে, তোর সাদির খাওয়া সোনা খেয়ে গেল। কলাপাতায় অনেক ছিল রে। গরুর জাত-বেজাত নেই, ওরা অনেক ভাল, ওদের খেলে দোষ হয় না। কিন্তু মরাছাড়ার কথা কোনদিন আর বলবি নে তারা। তা হলে মুখ দেখব না তোর।

চোখ মুছতে মুছতে সোনাকে তাড়িয়ে নিয়ে নুর চলে গেল। সন্দেশ নিল না কিছুতে।

বর তো হেঁটে বিয়ে করতে এসেছে, যে রকম গতিক কনেরও আড়াই ক্রোশ পথ হেঁটে স্টেশন অবধি গিয়ে শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে। বিয়ের পরের দিন গোপেশ্বর সঙ্কোচ ভেঙে জবেদের বাড়ি চলে গেলেন: জবেদ মিঞা, তারা শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে। তোমার গাড়ি-গরু থাকতে হেঁটে যাবে বিয়ের কনে?

জবেদ ঘাড় নিচু করে শুনছিল, মাথা তুলল। আশা হল গোপেশ্বরের। বললেন, বর আর কনে। সঙ্গে একটা পোর্টম্যাণ্টোও দিচ্ছি নে। শুকনো পথঘাট, তোমার গরুর কষ্ট হবে না।

তড়াক করে উঠে পড়ে জবেদ হনহন করে বেরিয়ে গেল। দাঁতে দাঁত ঘষলেন গোপেশ্বর। সব শয়তান, ভাল লোক নেই আর সংসারে। বাড়ি এসে বললেন, সন্ধ্যের পর বেরিয়ে পড়ব। জ্যোৎস্না রাত্রি—বরযাত্রী এত জন আছেন, আমরাও সঙ্গে সব যাচ্ছি। দল বেঁধে আস্তে আস্তে যাওয়া যাবে। কত পুরুষের বাসিন্দা এখানে, ডাক্তার হয়ে কত হাঁকডাক করে ঘুরেছি, দিনমানে মেয়ে নিয়ে পথের উপর বেরুতে আমার মাথা কাটা যাবে।

তারার মহা স্ফূর্তি : উঃ, ভারি তো পথ। বেগীর শ্মশান ছাড়িয়ে আর কতটুকু? জান না বাবা, ঠাকু-মা মলে শ্মশান অবধি চলে গিয়েছিলাম। আমি আর নুর—দু'জনে। স্টেশন আরও না হয় অতটা হোক শ্মশান থেকে। সেবারের যাওয়া-আসা মিলিয়ে তবে তো একই দাঁড়াল।

ট্রেন অনেক রাত্রে। একটা কামরায় সকলকে তুলে দিয়ে গোপেশ্বর ফেটে পড়লেন : রেলগাড়ি এখনো জাত-বিচার করছে না, সকলকে উঠতে দেয়। নয়তো স্টেশনের এই আড়াই ক্রোশের উপর আরও দশ ক্রোশ পথ ভাঙতে হত।

নন্দলালও চলেছেন পাঁচারই। তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, দ্বিরাগমনের কাজ নেই বেহাই। মেয়ে-জামাই পায়ে হাঁটিয়ে লোক হাসিয়ে আর নিয়ে আসব না। ও-পারে চলে যাব ঠিকই আছে। তারার বিয়ের জন্য দেরি করছিলাম। কন্যাদায় চুকল। এ পোড়া দেশে তিলার্ধ আর নয়। যা-কিছু আছে, বেচতে না পারি তো দানসত্র করে বেরুব। বনগাঁর ওদিকে তাড়াতাড়ি একটা ঘর তুলে সেইখানে ওদের নিয়ে যাব।

এসব হল কথার কথা। রাগের কথা। বসত উঠানো অত সোজা নয়। পাঁচ পুরুষ কেটেছে এই গাঁয়ে—তখন জানা ছিল

আরও পঞ্চাশ পুরুষ কাটবে। দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর ধরে ভূসম্পত্তি জিনিষপত্র আওলাতপশার গোছানো। মাংনা দিতেও সময় লাগে।

যদু হালদার গোপেশ্বরের প্রায় সমবয়সি। শিশুকালে এক পাঠশালায় পড়েছেন। হালদার মশায় আর মাস্টারি করেন না। বয়স হয়েছে, সে তো পুরানো কথা —কিন্তু হঠাৎ একেবারে খুনখুনে-বুড়ো হয়ে পড়েছেন। গোপেশ্বরের বাড়ি এসে তামাক খেতে খেতে বলেন, ভয় করে বুঝলে ডাক্তার। আগে ছাত্র ছিল, আমরা ছিলাম মাস্টার। এখন ছাত্রের ভিতরেও জাত হয়েছে। হালের নিয়মে বেত নিয়ে ক্লাসে যাওয়া বন্ধ। কিন্তু অঙ্কের মাস্টার আমার অসুবিধে ছিল না। স্কেল নিয়ে যাই। বোর্ডের উপরে দাগ কাটা চলে, আবার দরকার হল তো ছেলের পিঠে দিলাম এক ঘা বসিয়ে। কিন্তু ইদানীং ভয় করত। কে কোন জাতের ছেলে—হয়তো বা রটনা হয়ে গেল, হিঁদুর হাতে মুসলমানের নির্যাতন। কাজকর্ম ছেড়ে মানে মানে বেরিয়ে পড়েছি রে ভাই।

গোপেশ্বর বলেন, আমারও তাই। রোগি মরে গেল—তার পরে বলে বেড়াবে, মুসলমান বলে ইচ্ছে করে মেরে ফেলেছে। হোমিও-প্যাথি বলে নেহাৎ বিষ খাইয়েছি বলতে পারবে না। বলবে জল খাইয়ে খাইয়ে মেরেছে। হ্যাঁ, বলেছে তাই সত্যি সত্যি। হাতে ধরে আমেদটাকে মানুষ করলাম, সেই লোক। অসতের ছলের অসদ্ভাব নেই, বুঝলে?

গলা নামিয়ে সহসা জিজ্ঞাসা করেন, কদ্দূর এগোল ওদিকে?

যদু বলেন, পৌষমাস সামনে। পৌষে যেতে নেই। মাঘের গোড়ার দিকে বিদেয় হব।

গোপেশ্বর বলেন, আমি কালাকাল মানি নে। কী এমন মহৎ কর্মে

যাচ্ছি, তাই দিনক্ষণ দেখে যেতে হবে। যেদিন সুবিধা পাব, পোড়া দেশের মুখে লাথি মেরে চলে যাব।

বছর শেষ হতে যায়। সুবিধা আজও হয়ে ওঠে নি। গোপেশ্বরের ঘোরাঘুরির বিরাম নেই। জিনিসপত্র জায়গাজমি ইতিমধ্যে ঘুচিয়েছেনও বিস্তর। সীমান্তের পারে অল্প কিছু জঙ্গুলে জমি সোনার দামে খরিদ হয়েছে। জঙ্গলও কাটা হয়েছে, ঘর তোলা হবে এইবার।

এমনি সময় নিরঞ্জনের চিঠি—সর্বনেশে চিঠি : তারার বড় অসুখ। মুখে ঘা, আর জ্বর। উত্থানশক্তি-রহিত। রাতদিন কান্নাকাটি করে মার কাছে যাবে বলে। ডাক্তার-কবিরাজ এদিকে যারা ছিল সবাই সরে পড়েছে; ফকিরের জল-পড়ার উপরে আছে। শ্বশুরমশায় স্বয়ং যখন ডাক্তার মানুষ—

কিন্তু স্টেশন থেকে এই আড়াই ক্রোশ পথের ব্যবস্থা কি? নিরুপায় গোপেশ্বর মাথা হেঁট করে আবার জবেদের কাছে গিয়ে পড়লেন। গাড়িতে চাটাইয়ের নতুন ছই বানিয়েছে। ছইটা কাঁঠালতলায় খুলে রাখে, মানুষ শোয়ারি পেলে লাগায়। গরুর গাড়ি থেকে জবেদের ভাল রোজগার।

গোপেশ্বর বললেন, মঙ্গলবারে তারা আসছে। বড্ড অসুখ, হাঁটবার তাগত নেই। ভাড়া যা চাও, দেব জবেদ মিঞা। ভেবে দেখ, তারা আর নুরকে তুমি আলাদা চোখে দেখ নি।

জবেদ তিক্তকণ্ঠে বলল, সেসব দিন কবে চলে গেছে ডাক্তারবাবু। মাতব্বরদের কাছে একবার নাক-কান মলে দাওয়াত দিয়ে অনেক কষ্টে ছাড়ান পেয়েছি, এবারে কায়দায় পেলে নাক-কান কেটে ছেড়ে দেবে। দেশ জুড়ে হিঁদু-মোছলমানে কাটাকাটি করে শেষ হচ্ছে—আমাদের গ্রাম তবু তো ভাল, কেউ কারো গায়ে হাত তুলছে না। এর বেশি আর চাইবেন না যে মোছলমান হয়ে হিঁদু শোয়ারি তুলব আমার গাড়ির উপর।

মঙ্গলবারের দিন যথাসময়ে গোপেশ্বর স্টেশনে চলেছেন। গজর-গজর বকছেন আপন মনে: পাঁচরইয়ে ডাক্তার-কবিরাজ নেই, এখানে আমি আছি। ত্রিভুবনের কোন চুলোয় তো ঠাঁই নেই, ভুষণ্ডী-কাক হয়ে আছি পড়ে এখানে। মস্তবড় সিভিল-সার্জন কিনা, মস্ত ডিসপেনসারি, মেলা অষুধপত্তোর—মেয়ের অসুখ আমি তাই মজা করে চিকিচ্ছে করব।

সময় থাকলে গোপেশ্বর পালটা চিঠি লিখে মানা করে দিতেন। এদ্দিন ভুগছে তো ভুগুক আরও মাস দুই। তার মধ্যে যেমন করে হোক একটা দোচালা খোড়ো ঘর তুলে ফেলবেন বনগাঁয়। পৈতৃক ভিটের মুখে ঝাড়ু মেরে সেইখানে মেয়ে নিয়ে উঠবেন। উত্থানশক্তি-রহিত তো সে মেয়ে পথ হাঁটবে কি করে? স্টেশনে গিয়ে তারাকে একটিবার চোখের দেখা দেখে ফেরত-টিকিট কেটে সঙ্গে সঙ্গে পাঁচারই পাঠিয়ে দেবেন। সেই জন্যে যাচ্ছেন গোপেশ্বর।

গরুর গাড়ি যায় ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলে। কে হে তুমি মাথায় গামছা জড়িয়ে বসে—জবেদ মিঞা না? কোথায় যাওয়া হচ্ছে জবেদ?

জবেদ বলে, আজকাল ধানের ব্যাপার করি ডাক্তারবাবু। ভাল মুনাফা। বস্তা নিয়ে যাচ্ছি। গঞ্জ থেকে ধান কিনে গাড়ি বোঝাই দিয়ে আনি; গাঁয়ের খেয়ো-খদ্দেরে কেনে।

সবে সন্ধ্যা পার হয়েছে। কিন্তু যেন রাত দুপুর। আকাশ মেঘে থমথম করছে। বর্ষাকালে এমনিই তো হবে। আগে থেকে কোন রকম ভাল ব্যবস্থা না করে এই দুর্যোগে—দেখ দিকি কাণ্ড—রোগা মেয়েটাকে নিয়ে নিরঞ্জন ট্রেন থেকে নামল। কি করেন এখন গোপেশ্বর? সত্যি সত্যি কি বলবেন ফিরে যাবার জন্য?

যে ক'টি যাত্রী নেমেছে তারা সরে গেলে, অন্ধকার বাদামতলার দিক থেকে গাড়ি ঠেলে আনছে কে এদিকে। কে?

জবেদ চাপা গলায় বলে, চুপ।

ঠাহর করে করে তারাকে দেখে যেন হাহাকার করে উঠল: কী মেয়ে নিয়ে গিয়েছিলে, এ কাকে নিয়ে এলে জামাই? হায়রে কপাল, বাঁধা ছইখানা বাড়িতে রেখে দিয়ে এলাম, মানুষে সাত-সতেরো জিজ্ঞাসা করবে সেই ভয়ে। ধানের বস্তা গুড়ের নাগরি যে ভাবে নেয়, মেয়েটাকে আমার তেমনি করে নিতে হবে গো!

দুর্গাকে বিয়ের সময় থেকেই নিরঞ্জন দেখে আসছে জবেদের কি সম্পর্ক ডাক্তারবাড়ির সঙ্গে। আজকের অবস্থাও জানে। বলে, জবেদ চাচা, তুমি গাড়ির ধারে-কাছে থেকো না। কী দরকার! আমি চালিয়ে যাব।

জবেদ হেসে ফেলল: ছাগলের পায়ে ধান পড়লে লোকে গরু কিনত না, বুঝলে জামাই?

আচ্ছা, দেখই না ছাগলের কাজ। যা ভাবছ তা নয়। ষোল-আনা গেঁয়ো—শহুরে গন্ধ একটুও গায়ে নেই।

জবেদ বলে, রোসো। বড় দপিটা পার করে দিই—তার পরে।

দপি হল যে জায়গায় কাদা অত্যধিক গভীর, পার হওয়া কষ্টকর। বলে, দপি পার হয়ে পাড়ার ভিতরে পড়বে। তখন তোমরা কারা, আমিই বা কে? ডাক্তারবাবুর তো সব জায়গায় রুগি, তল্লাটের সকলে চেনে। পা চালিয়ে আপনি বাড়ি গিয়ে উঠুন ডাক্তারবাবু। নয় তো গরুর গাড়ির অনেক পিছনে পড়ে যান। গাড়ির সোয়ারির সঙ্গে যেন কোন রকম সম্পর্ক নেই।

দপি পার হয়ে গিয়ে জবেদ গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ল। বলে, দেখি মুরোদ। মুখের বড়াই—কাজে সেটা কদ্দুর, এইবারে দেখি।

চালাচ্ছে নিরঞ্জন। তারা এগিয়ে তার পাশটিতে এসেছে। সে-ও চালাবে। জবেদ থাকতে পারে না, তাড়া দিয়ে ওঠে: দু'জনে দুই গরু চালাচ্ছ। আহা, অত তাড়িয়ে রেলগাড়ি চালাতে কে বলে

তোমাদের ? গরুর কষ্ট হয় না ! বলিহারি ক্ষমতা তোর তারা। বলি, চামড়ায় ঢাকা শুধু ক-খানা হাড় —হাড়গুলো খুলে খুলে পড়বে যে !

কিন্তু যা-কিছু বলবে ওই দূরে থেকেই। কী মজা হয়েছে—কাছে আসবার জো নেই জবেদের। কে কোথায় দেখে ফেলবে। এক চাষী-বাড়ির একেবারে পিছনে এসে পড়েছে এখন—জোর গলায় তাড়াও তো দিতে পারছে না আপাতত। বাহাদুরি দেখাবার এমন সুযোগ কে ছেড়ে দেয় ? ডাইনের গরুর লেজ মলে পাকা গাড়োয়ানের মতো তারা হাঁক দিচ্ছে : ঠায় ঠায়, আরে ডাইনে—

এবং যে ভয় করা গিয়েছিল—আটকে গেছে গাড়ি। একটুখানি ডাইনে কাটিয়ে গেলেই হত। কিন্তু এ-পথে চলাচল নেই, আর চালাচ্ছে দুই গরু ওরা দু'জনে। তারা ল্যাজ মলে দিয়েছে ডাইনের গরু সোনার। তাতে উল্টো-উৎপত্তি, শয়তানি করে সে ঘাড় নামিয়ে নিল। গাড়ি বেঁকে গিয়ে পড়ল কাদার মধ্যে।

ঠায় ঠায়—

হাটুরে মানুষ ক-জন জুটেছে পথে, জবেদ গল্প করতে করতে চলেছে তাদের সঙ্গে। কিন্তু কান খাড়া সামনের দিকে। সেই অঘটনই ঘটল শেষটা ! কার না কার গাড়ি যাচ্ছে, এমনি ভাবে জবেদ হাঁক দেয় : কি হল তোমাদের গো ?

চাকা বসে গেছে—

পথে ঘাটে লোকের বিপদে ছুটে যেতে হয়। জবেদ তেমনি ভাবে তাড়াতাড়ি পা ফেলে কাদায় ভুটভাট আওয়াজ তুলে গাড়ির দিকে যাচ্ছে। পথের সঙ্গী অনতিদূরের লোকগুলোর দিকে আড়-চোখে চেয়ে বলে, বাবুর মতন চেপে বসে থেকে হবে না গো ! নেমে পড়ে চাকা মার, তবে গাড়ি উঠবে।

লোকগুলো নিরস্ত করে : তোমার কি মাথাব্যথা মিঞা-ভাই ? বয়ে গেছে ! যা পারে করুক গে ওরা।

আনাড়ি মানুষ, দেখতে পাও না ?

বাবু মানুষ। তুমি কাদায় পড়লে ওরা আসবে কাঁধ ঠেলতে ? চলে এস ভাই, আমাদের কি !

তখন নিস্পৃহভাবে আবার সঙ্গ নিতে হয় লোকগুলোর। লোক-দেখানো ভাবে খানিকটা এগোতে হয় তাদের সঙ্গে। তারপরে বাঁয়ে পথ পেয়ে জবেদ আলাদা হয়ে গেল। এদিক-ওদিক চেয়ে আবার ফিরছে। সত্যি, বেহাল অবস্থা ওদের। সোনাটা সেই ঘাড় সরিয়ে আছে, যত চাপ একলা রূপোর উপর। মুখ থুবড়ে না পড়ে কাদায়, গাড়ি না উলটে যায় ! জবেদ ছুটে গিয়ে পড়ে। জোয়াল থেকে রূপোকে আগে খুলে কাদা পার করে বাবলাগাছের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে এলো। ফিরে এসে অবাক।

ঐ অবস্থা তারার—সে-ও নেমে পড়েছে কাদার মধ্যে। এক চাকা নিরঞ্জন ঠেলছে, আর এক চাকায় তারা। তারারই পুলকটা বেশি—কাদা মেখে একেবারে ভূত। দেখে তো ক্ষণকাল কথাই বলতে পারে না জবেদ, চোখ বড় বড় করে চেয়ে থাকে : ওরে তারা, অসুখ না তোর ?

তারার আজ ভারি আনন্দ। বাপের বাড়ি আসছে। বাপকে দেখল। একটু পরে মা নুর এবং গাঁয়ের সকলকে দেখতে পাবে।

জবেদ ধমক দিয়ে ওঠে : আচ্ছা ধিঙ্গি হয়ে এসেছিস ক'টা মাস শ্বশুর-ঘর করে ! জামাই কি ভাবছে বল দিকি ?

মুখরা মেয়ে বলে, গাড়ির উপরে বসে থাকলেই বুঝি ভাল হত ? গতরের ভারে চাকা আরও তো বসে যেত।

মোটা হয়ে হাতীর মতন হয়ে এসেছিস কিনা, গতরের দেমাক হচ্ছে ! গতরের ভার তো এক ছটাক। কাদা যা গায়ে মেখেছিস, তারই যেটুকু ভার !

তারপর নিরঞ্জনের উপর খিঁচিয়ে ওঠে : কেমন মরদ হে তুমি ? রোগা বউ চাকা মারছে, শাসন করতে পার না ?

হাসে নিরঞ্জন। তারা খলখল করে জবাব দিল : এক চাকা ঠেলে গাড়ি ওঠে না জবেদ চাচা। দু-চাকায় দু-জন লাগে। তুমি তো ঘূরে ঘূরে—আর একটা মানুষ তবে কোথায় পাওয়া যায়, সেইটে বল।

জবেদের চমক লাগে। মুখের মতন জবাব। তাকে স্পষ্টাস্পষ্টি ঠেশ দিয়ে বলা। ছোট্ট বয়সে তারাকে কত কোলে-পিঠে করেছে, তারই শোধ দিল ঠাস করে ঐ কথার চাপড় মেরে। কত আর সহা যায়, কতক্ষণ আলগোছ হয়ে থাকা চলে! হুঙ্কার দিয়ে উঠল সেই আগেকার মতন, তারা যখন ছোট্ট ছিল : শুকনো ডাঙায় ওঠ গিয়ে তারা, ভালর তরে বলছি। বিয়ে হয়ে লাটসাহেব হয়েছিস ? দীঘির ঘাট থেকে হাত-পা ধুয়ে দাঁড়া। আমরা যাচ্ছি।

আর ঠিক সেই সময়ে প্রশ্ন : গরুর গাড়ি কার, কে আসে ?

মানুষ হও আর গাড়ি হও পাড়াগাঁয়ে পথ চলতে এমনি সব কথার জবাব দিয়ে যেতে হবে। হায়রে, এমন নিশিরাত্রেও সমাজ কি একটুখানি ঘুমোবে না ? প্রশ্ন আসে : গাড়ি যাবে কোথায় গো ?

এবং বাঁক ঘুরে এসে হ্যারিকেন দেখা দিল। জবেদ সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ে কাদার মধ্যে। যেন আছাড় খেয়ে পড়েছে। কি হবে তাতে ? হ্যারিকেন উঁচু করে তুলে আখেজ বলেন : জবেদ মিঞার সোনা গরু। এঃ হে-হে—আছাড় খেলে নাকি জবেদ, কাদায় পড়ে গেলে ?

আখেজ গোলদার সদরে চলেছেন কোন এক মামলার সাক্ষি-সাবুদ নিয়ে। জবেদ উঠে পড়েছে। মুখে কাদার প্রলেপ, চোখ দুটো তার মধ্যে পিট-পিট করছে। কিন্তু হলে কি হবে ? সোনার অত্যাচারে ক্ষেতের বেড়া কারো আস্ত থাকে না, গরুটাকে সকলে

ভাল রকম চিনে রেখেছে। সোনা গরু সঙ্গে থাকলে মুখে কাদা মেখে জবেদের আত্মগোপনের উপায় নেই।

আখেজ বললেন, গাড়ি নিয়ে কোথায় গিয়েছিলে জবেদ মিঞা ? সঙ্গের লোকটা কে হে ? মেয়েটা তারার মতো লাগে। ও তারা, বাপের বাড়ি যাচ্ছিস জবেদ মিঞার গাড়ির সোয়ারি হয়ে ?

কী আশ্চর্য ব্যাপার ! মাস খানেক পরে একদিন পায়ে হেঁটে দুর্গা এসে উপস্থিত। বড়গিন্নির শ্রাদ্ধের সময় দেওরকে নিয়ে গরুর গাড়ি করে এসেছিল, বাচ্চা তিনটে ছিল সঙ্গে। আজ একেবারে একা। স্টেশন থেকে বৃষ্টিবাদলার মধ্যে আড়াই ক্রোশ পথ হেঁটে চলে এলো— দেহের ঐ দশা, কোন সাহসে বেরিয়ে পড়েছে সেই জানে। একটা খবর পর্যন্ত দেয় নি গোপেশ্বরকে। দিলেও গাড়ি-পালকির উপায় হত না—তবে গোপেশ্বর নিজে কিম্বা যদু হালদার, কেউ না কেউ স্টেশনে উপস্থিত হয়ে সঙ্গে করে আনতে পারতেন। ছাতাও থাকত। সর্বাঙ্গে কাদামাটি মেখে আধ-পাগলের চেহারায় দুর্গা উঠানে এসে ঢুকল।

এসেই প্রথম কথা : ওরা কোথায় ?

মা হয়েও নির্মলা প্রথমটা চিনতে পারেন নি। চিনে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। বললেন, এমনভাবে চলে এলি, কি ব্যাপার ?

প্রশ্ন কানে না নিয়ে দুর্গা ঘাড় নেড়ে জেদের ভঙ্গিতে বলে, ওরা কি করছে সেই জবাব দাও আগে।

কাদের কথা বলছিস ?

ভাতার-সোহাগিনী তোমার ছোট মেয়ে, মাগমুখো তোমার ধেড়ে জামাই—

মাথা ঠিক খারাপ হয়ে গেছে, নয়তো দুর্গা হেন মেয়ের মুখে এই কথা ! মায়ের প্রাণ হায়-হায় করে ওঠে। মেয়ের হাত দু-খানা জড়িয়ে ধরে নির্মলা সহজভাবে জবাব দিলেন, তারা তো বিছানায় পড়ে।

এত বেলা অবধি ওঠেন নি এখনো মহারানী ? অভ্যেস কি রকম হয়েছে, তাই দেখ। আমি দাসী-বাঁদি ঘর ঝাঁট দিয়ে বাসন মেজে ক্যানসা-ভাত রেঁধে রাখি, ওঁরা ঘুম ভেঙে উঠে চোখ মুছতে মুছতে থালা টেনে নিয়ে বসেন। ওখানে এই হত, এখানেও তাই ?

গোপেশ্বর তারার কাছে ছিলেন, টের পেয়ে বাইরে এলেন। দুর্গার কথাগুলো কানে গিয়েছে। বললেন, চুপ কর—চুপ কর বলছি দুর্গা। অর্ধেক মরে আছে, কথার খোঁচায় ওকে আর এ-ফোড় ও-ফোড় করিস নে। জলকাদা ভেঙে রাত দুপুরে সেই যে গরুর গাড়ি থেকে নামল, তার পরে একটা দিন উঠে বসে নি মা আমার ! তারার দশায় পাষাণ ফেটে জল বেরোয়, মায়ের পেটের বোন হয়ে লজ্জা করে না এইসব বলতে ?

দুর্গা তখন বিড়বিড় করে একটানা নিজের সঙ্গে কি বলে। পাগল হয়ে গেছে নাকি ? তারা ঘরের মধ্যে বিছানায় পড়ে এপাশ-ওপাশ করছে, আর দুর্গার এই গতিক।

নির্মলা তাড়াতাড়ি মেয়েকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিলেন। গোপেশ্বরের দিকে তাড়া দিয়ে ওঠেন : তুমি যাও দিকি নিজের কাজে। দুর্গার গায়ে মাথায় হাত বুলাচ্ছেন। তারপরে খানিকটা শান্ত হলে ভিন্ন কথা পাড়েন : দেশের এই দিনকাল—একা একা কোন সাহসে বেরুলি তুই মা ?

দুর্গা বলে, দোকা কোথায় পাই ? ক'টা দারোয়ানের জিম্মায় রেখে এসেছিল, জিজ্ঞাসা কোরো তোমাদের জামাইকে। তাকে দেখতে পাচ্ছি নে, সে কোথায় ?

নিরঞ্জন বাড়ি ছিল না। মামা নন্দলালের নাম করে বেরিয়েছে। কিন্তু সেখানে নয়, গেছে ব্রতীনদের বাড়ি। রোজই যায়। খাসা আছে ব্রতীন। বুড়ো বাপ মরে গেছে, বোন মলিনার ওই ব্যাপার—চাকরির দরখাস্ত পাঠানো ইদানীং ছেড়ে দিয়েছে। একমুখ হেসে বলে,

কিসের জন্য ? কাঁধ খালি হয়ে গেছে, দায়ঝক্কি নেই। আছে সে সর্বক্ষণ তাস-দাবা-পাশা নিয়ে। একটা মাত্র ভাবনা, সকাল-সন্ধ্যায় খেলুড়ে সংগ্রহ করা। বাড়িতে কেউ এলো না তো ছক-গুঁটি পুঁটলি করে নিয়ে নিজেই এর-ওর বাড়ি হানা দেয়।

নিরঞ্জন আসার পর থেকে খেলুড়ের দুশ্চিন্তাটা গেছে আপাতত। দাবাখেলায় দু-জন মাত্র লাগে, খেলেও ভাল নিরঞ্জন। সকালের দিকে একটু বেলায় ঘুম ভেঙে উঠে জলটল খেয়ে সে বেরিয়ে পড়ে। সন্ধ্যার দিকেও যায় প্রায়ই। তারার এত বড় অসুখ—এমনি অবস্থায় অহরহ খেলায় মেতে আছে, এটা সে জানতে দিতে চায় না। শ্বশুর-শাশুড়ি কি ভাববেন, লোকে কি বলবে! মামার বাড়ির কথা বলে বেরিয়ে যায়ঃ সম্পত্তি-ঘটিত ব্যাপারে মামার সঙ্গে শলাপরামর্শের জরুরি দরকার, ইত্যাদি। গোপেশ্বর-নির্মলা জানেন সমস্ত, কিন্তু জামাইয়ের মেজাজ বুঝে ন্যাকা সেজে থাকতে হয়। মেয়ে দিয়েছেন—একটা নয়, দু-দুটো—আর এখন উপায় কি ?

নাওয়াখাওয়ার বেলা হয়েছে দেখে নিরঞ্জন ফিরল। খাওয়া অন্তে লম্বা ঘুম দেবে অপরাহ্ন অবধি।

দুর্গাকে দেখে অবাক হয়ে গেছে। নির্মলার কথার জের ধরে সে-ও জিজ্ঞাসা করে, ছেলে তিনটে কোথায় ফেলে এলে—তোমার গুণময়ী শাশুড়ি ঠাকরুনের কাছে ? আমার নামে কান ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে এই অবস্থা যিনি করে তুলেছেন ?

দুর্গা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে : তিনটে ছেলে আর আধ-মরা বউ তুমিই বা কার কাছে রেখে ছুঁড়ি-বউ নিয়ে চলানি করতে এসেছ ? তুমি যেটা পার, আমার তাতে আটকায় কিসে ?

কুরুক্ষেত্র বেধে যাওয়ার ব্যাপার। দুর্গাকে ধরে নির্মলা টানতে টানতে সেখান থেকে রান্নাঘরের দিকে নিয়ে গেলেন। দুর্গা চিৎকার করে কাঁদেঃ এদ্দিন এসেছে, একটা চিঠি লিখে খোঁজ নিল না,

আমরা প্রাণে বেঁচে আছি কিনা। এত পাষণ্ড আগে ছিল না মা, তারা শয়তানী গুণ করেছে।

নির্মলা তাড়াতাড়ি তার মুখে হাত চাপা দেন : চুপ, চুপ! তারা শুনে ফেলবে। তুই তো জোর করে বিয়ে দেওয়ালি। এখন তবে কি জন্যে বলিস?

সংসার বজায় থাকবে, ওর মতিগতি ভাল হয়ে যাবে, ছেলেপুলের ভাল হবে—নিজের বোনকে এইজন্যে ঘরে নিয়ে তুললাম। কাল-সাপিনী তার শোধ তুলছে। বর আগলে আছে সর্বক্ষণ আদেখলের মতন। আমার সঙ্গে কথা বলতে দেয় না, চোখ তুলে একনজর তাকাতে দেয় না আমার দিকে। সদরে মামলার পর মামলা খারিজ হয়ে যাচ্ছে, তা যেন দুই পায়ে শিকল পরিয়ে ঘরের ভিতর পুরুষটাকে ভেড়া বানিয়ে রেখেছে।

নির্মলা ব্যাকুল হয়ে বলেন, ক্ষমা দে ওরে দুর্গা। ক-দিন আজ বড্ড বাড়াবাড়ি। অসুখের জ্বলুনি, তার উপরে তোর কথার জ্বালা সইতে পারবে না। তারা মারা পড়বে।

দুর্গা মুখ তুলে বলে, সত্যি অবস্থা খারাপ?

হ্যাঁ রে, হ্যাঁ। কাল থেকে তোর বাপ সর্বক্ষণ বিছানার পাশে বসে আছেন।

ফিচ করে পিক কেটে ক্ষণকাল মায়ের দিকে চেয়ে থেকে দুর্গা যেন পরিতৃপ্তির সঙ্গে খবরটা শুনে নিল। ঘাড় নেড়ে বলে, অসুখ না কচু—তোমরাও যেমন! ছুতো-ধরা বুধোর মা, চালতেতলায় যেও না—ওদের হল সেই বৃত্তান্ত। কাপ ধরেছে—বাবা সেটা ধরতে পারেন নি। পাঁচারইয়ে সে কী কাণ্ড! বেলেল্লাপনা দেখে দেখে পাড়ার মানুষ অবধি যাচ্ছেতাই করে বলতে লাগল—অসুখের নাম করে তখনই তোমাদের ঘাড়ে এসে চাপল। কিচ্ছু নয়—গেলাম-গেলাম করে দর বাড়ায় তোমাদের কাছে।

এরই ছুটো দিন পরে তারা মারা গেল।

যা অবস্থা হয়েছিল, চোখ তুলে চাওয়া যেত না হতভাগীর দিকে। গোড়ায় সেই যে মুখের উপর ঘা—তেমনি ঘা সর্বদেহে ফুটে বেরুল। জ্বর অবিচ্ছেদি। কোমরে নিদারুণ ব্যথা। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্রমশ অসাড় হয়ে পড়ছে। আহা, এই পক্ষাঘাতটা সকলের আগে যদি মুখে হত, তবে আর কানের কাছে রাতদিনের কাতরানি শুনতে হত না।

মরে গিয়ে বাঁচল তারা। নির্মলা আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছেন। গোপেশ্বরের চোখে জল নেই। হঠাৎ এসে ছুর্গার হাত চেপে ধরলেন। বলেন, আয় ইদিকে, শুনে যা—

এক রকম টেনেহিঁচড়ে নিয়ে চললেন লিচুতলার দিকে। ভয় পেয়েছে বুঝি ছুর্গা। থমকে দাঁড়াল, আর যাবে না। বলে, যা বলবার বল এইখানে—

গোপেশ্বর চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিলেন। না, কেউ নেই। মড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য নিরঞ্জন লোক ডাকতে গেছে, আসে নি এখন পর্যন্ত কেউ। চোখে জল না পড়ুক মুখে চিৎকার না করুন, মনের মধ্যে বিছার কামড়ের জ্বলুনি—গোপেশ্বরের কণ্ঠস্বরে তা টের পাওয়া গেল। বললেন, খুনে তুই। মায়ের পেটের ছোট বোনের সর্বনাশ করেছিস। পচে পচে মরল। বল রাক্ষুসি, কী দোষ করেছিল সে তোর কাছে ?

অবুঝের মতো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে ছুর্গা বলে, আমি কি করলাম ?

ডাক্তার আমি। রোগ ঘেঁটে ঘেঁটে বুড়ো হয়েছি। তোর মাকে পর্যন্ত বলি নি, শুধু নিজের মনের মধ্যে রেখেছি। কি জন্যে তুই বিয়ের ঘটকালি করেছিল নিরঞ্জনের সঙ্গে ?

ছুর্গা বলতে যায়, বাঃ রে, তোমরা মোটে বর পাচ্ছিলে না—

তাড়া দিয়ে গোপেশ্বর থামিয়ে দিলেন। ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললেন,

শয়তানটার এত বড় খারাপ ব্যাধি ঘুণাক্ষরে জানতে দিলি নে আমাদের ?

ভয় ঝেড়ে ফেলে দুর্গা বাপের মুখোমুখি তাকাল : জানলে কি দিতে তোমরা বিয়ে ? সর্বনাশ আমি করতে চাই নি। কচি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হলে রোগ সেরে যায়—ভাবলাম, সব ভাল হবে আবার। নয়তো সতীনকে কে কবে ঘরে ডেকে নিয়ে তোলে ? হোক না বোন-সতীন।

বলতে বলতে হেসে উঠল। উৎকট অস্বাভাবিক হাসি—হাসি অথবা কান্না। বলে, কালব্যাধি আমাকেও ধরেছে। আমি কার কাছে কোন দোষ করেছিলাম, জিজ্ঞাসা করি। পুরানো ডাক্তার বলে বড়াই কর বাবা, কিন্তু আমার রোগ তো বুঝতে পার নি। অনেক আগে আমায় ধরেছে। তারাকে পেলে ওর মতিগতি ভাল হবে, ছেলেপুলে বাবা-বাবা করে কাছে যেতে পারবে, আবার ঘরগৃহস্থালী হবে—কিচ্ছু হল না। উল্টে এই দাঁড়াল, সংসারে তবু যতটুকু আমার জায়গা ছিল তারা লক্ষ্মীছাড়ি এসে একেবারে তা ছিনিয়ে নিল। আমার মুখে লাথি মেরে ছেলেপুলের চোখের উপরে সারাক্ষণ ঘুগলে মাতামাতি করেছে। হবে না এই রকম—বেশ হয়েছে !

শ্রাবণ মাস। ঝুপঝুপে বৃষ্টি, দিনরাতের মধ্যে জিরান নেই। আঙুল মটকে শাপশাপান্ত করে দুর্গা ফরফরিয়ে চলে এলো, সেই থেকে একেবারে চুপ। মরা তারার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। এইবারে বোধ হয় বুঝল, অসুখটা সত্যিই—বর নিয়ে পালিয়ে আসবার ছুতো নয়। তারা বউ হয়ে গেল সেই তখন কয়েকটা দিন—তার পরে দুর্গা মুখ ফিরিয়ে সরে গেল, আর কোনদিন তাকিয়ে দেখে নি বোনের দিকে। বোন নয়, সতীন। অশথ-তলায় বাস করি, সতীন কেটে নাশ করি। অশথ-পাতা নড়ে চড়ে, সতীন যেন পুড়ে মরে।

সেই সতীন। কাঁদতে কাঁদতে নির্মলা পাগলের মতো হয়ে গেছেন। এই আকাশ ফাটিয়ে চেঁচান, এই গুনগুন করেন সুরেলা গানের মতো। মড়ার পাশে মাটির উপর জোরে জোরে মাথা কোটেন। অনেকক্ষণ দুর্গা চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখে দ্রুতপায়ে ঘরে ঢুকে গেল।

যত ঝঞ্ঝাট এখন নিরঞ্জনের। গোপেশ্বর হাত-পা ছেড়ে বসে পড়েছেন—মড়ার যাবতীয় ব্যবস্থা তাকেই করতে হচ্ছে। ভাগ্যবতী অশীতিপর বড়গিন্নি নয়—মাত্র তিনটে বছর আগে হলেও তখন আর এক দিনকাল। বড়গিন্নির আদরের ছোট নাতনি এই পোড়া কালের পোড়ারমুখী তারা—মরে গিয়েও কী জ্বালাতন করছে! শনিবার দুপুরবেলা মরেছে—শনি গিয়ে রবিবারের দিনও কেটে যায়, চব্বিশ ঘণ্টার বেশি হয়ে গেল। বাড়িতে বাসি মড়া—মাছি পড়তে শুরু হয়েছে, গন্ধ বেরুবে এর পরে, পোকা ধরবে। পাড়ার মধ্যে ঘুরে ঘুরে নিরঞ্জন হয়রান। ছ-সাতটা শ্মশানবন্ধু জোটানো যাচ্ছে না। স্বজাতি আত্মীয়-কুটুম্ব চুলোয় যাক, অত বাছাবাছির দিন আর নেই —মড়া বইবার যে-কোন রকমের মানুষ।

সর্বপ্রথমে ও-পাড়ায় মাতুল নন্দলালের কাছে গেল—তার যেখানে জোরের জায়গা। নন্দলাল কপাল চাপড়ান: আমরা বুড়োরা কোথায় চলে যাব, ওরা গোবরমাটি ছড়াঝাঁট দেবে—তা নয়, কলিকালের উল্টোধারা। নন্দলাল হাপুসনয়নে কেঁদে সারা, তাঁর কাছে মড়া বওয়ার প্রস্তাব করে কি করে?

গেল ব্রতীনের বাড়ি। ব্রতীন দাবা সাজিয়ে নিয়ে একাই দু-পক্ষের চাল দিচ্ছে। গভীর অভিনিবেশ। অবশেষে মাথা তুলে নিরঞ্জনকে দেখে বলল, শুনেছি—শুনেছি। আজকের দিনে তুমি আসতে পারবে না—তা দেখ, খেলা কিন্তু বন্ধ নেই। তোমার হয়ে এই বাঁ-হাতে সাদা-গুঁটির চাল দিচ্ছি, আর ডান হাতে আমার নিজের রাঙা-গুঁটির।

বড় ব্যস্ত নিরঞ্জন। তা হলেও একলা মানুষ দু-জনের হয়ে খেলে যাচ্ছে, এই অভিনব ব্যাপার দেখতে হয় দাঁড়িয়ে মিনিটখানেক। বলে, আমার গুঁটির চাল বাঁ-হাতে দিচ্ছ ব্রতীন, ডান হাত দিয়ে কেন নয়? এত হেলাফেলার খেলোয়াড় আমি?

ব্রতীন ফ্যা-ফ্যা করে হাসে। বলে, সন্ধ্যেয় আসছ তো? উঁহু, সন্ধ্যের মধ্যে শ্মশান সেরে উঠতে পারবে না। আসছ তবে কাল সকালে। কাল তোমায় এমনি মাত নয়—একখানা অশ্বচক্র করে দেখাব, কোন দরের খেলোয়াড় তুমি।

দেখা যাবে কে কাকে অশ্বচক্র করে—

বেরুল সে ব্রতীনের বাড়ি থেকে। দু-জনের ভাবনা এক মাথায় ভাবছে, এ মানুষকেও শ্মশানযাত্রী হতে বলা যায় না। হিন্দু মানুষ গাঁয়ে সামান্যই আছে, কেউ নিরঞ্জনের অচেনা নয়। যার কাছে যায়, এক একটা অজুহাত। কারো বাড়িতে জ্বর, কারো বা পেট নামছে। গলা খাটো করে আরও একটা কথা বলে কেউ কেউ—বউ পোয়াতি। পোয়াতি বউয়ের স্বামীর শ্মশানে-মশানে যেতে নেই। দোষ-দৃষ্টি লাগে। যাঁরা সব অলক্ষ্যে বায়ুভূত হয়ে ঘুরছেন, শ্মশান থেকে হয়তো বা তাঁরা ভর করে এলেন গর্ভিনীর গর্ভে ঢুকে পুনর্জন্মের প্রত্যাশায়। একটি ভ্রূণ তো আগে থেকেই দখল করে আছে—গর্ভের ভিতরে নতুন জন এসে জায়গা নিয়ে হুটোপুটি বাধায়, প্রসূতির প্রাণসংশয়। জ্বর হয়েছে বলে কাঁথা মুড়ি দিলে নাড়ি টিপে দেখা চলে, কিন্তু পোয়াতি বউয়ের কথা বললে চুপচাপ ফিরে যাওয়া ছাড়া অন্য পন্থা নেই। উঃ, এতও আসে মানুষের মাথায়!

বাঁশবাগানটুকুর ঠিক ওপারে গোপেশ্বর ডাক্তারের বাড়ি এত বড় সর্বনাশ, জবেদকে কিন্তু ঘরের বাইরে কেউ দেখল না। দুয়োরে খিল এঁটে আছে নাকি? সমাজে সে একঘরে। হুঁকো দেবে না কেউ, হাজাম বন্ধ, ধোপা বন্ধ। মৌতেখানায় সাদির খানায় দাওয়াত পাবে

না। মরলেও কেউ মাটি দিতে যাবে না গোরস্থানে। আচ্ছা বেকায়দার ফেলেছে।

ঘুরে ঘুরে নাজেহাল হয়ে নিরঞ্জন শেষটা শাসানি দেয়ঃ যা ভাবছেন সেটা হচ্ছে না মশায়রা। গাঁয়ের জামাই বলেই এতক্ষণ ধরে প্যানপ্যান করে বেড়াচ্ছি—জানেন না আমায়, নিজমূর্তি ধরব কিন্তু এইবারে। পচা মড়ার গন্ধ আমরা একা শুঁকব না, সকলকে ভাগ করে নিতে হবে। রাত্তির হোক না, মড়া টেনে অন্য বাড়ির দরজায় রেখে আসব। নিজের গরজে তখন অন্য কোথাও চালান করুন, কিম্বা শ্মশানে নিয়ে পুড়িয়ে আসুন। তাই করব ঠিক, আর লোকের খোশামুদি করতে যাচ্ছি নে।

বলে রাগে রাগে বাড়ি এসে হাত-পা ধুয়ে সে কামরার ভিতর ঢুকে গেল। তারার ওষুধ-পথ্য কেনবার নামে ইতিমধ্যে একবার সদরে বেড়িয়ে এসেছে। জানা আছে যে আজকালের মধ্যে এই বর্ষাকালের ভিতরেই শ্মশানের কাজে যেতে হবে। ভন্না খেয়ে বেঘোরে মরতে পারে না, উষ্ণ হবার উপায় নিয়ে এসেছে। আজকে তো সেই দিন। ফাঁক বুঝে তাই তৈরি হয়ে নিচ্ছে একটু।

হলধরের বউ পাংশুমুখে বলে, শুনলে তো কি বলে গেল? মড়া এনে আমাদের বাড়িতেই রেখে যায় যদি? সকালে দুয়োর খুলে দেখব, দাওয়ার উপরে দাঁত বের-করা কিম্ভূতকিমাকার পড়ে আছে ছেলেপুলে ডরাবে। শনি-মঙ্গলবারের মড়া আবার একলা যায় না, দোসর খুঁজে সঙ্গে নিয়ে যায়। তুমি চলে যাও এক্ষুণি। মড়া যদি ফেলেই দেয়, অন্য কোথাও ফেলুকগে—আমাদের বাড়ি না আসে।

হলধর ভেবে দেখে, বউ বলেছে পাকা কথাই। গামছা কোমরে বেঁধে সে চলল।

নিরঞ্জন বলে, এই যে, খুড়োমশায় এসে গেছেন। ছোটকাল থেকে তারাকে দেখছেন আপনারা, কত দিষ্টিমুখ দিয়েছেন, আপনার

বাড়িটাও কাছে-পিঠে। পাঁজাকোলা করে আপনার ওখানেই রেখে আসব ভাবছি, আপনি মেয়েটার গতি না করে পারবেন না।

হলধর তাড়াতাড়ি বলে, না বাবাজি। একগাদা বাচ্চা ছেলেপুলে নিয়ে ল্যাজে-গোবরে হচ্ছি, আমায় রেহাই দাও। কিন্তু হীরু বর্ধন একলা মানুষ, বউটা ওপারে খুড়োর কাছে রওনা করে দিয়েছে—তার আক্কেল বুঝে দেখ, তারই তো সকলের আগে লাফিয়ে পড়া উচিত।

নিরঞ্জন বলে, দু'জনে ধরাধরি করে বর্ধনের বাড়ি রেখে দিয়ে আসি তবে।

বলতে বলতে হীরালাল এসে উপস্থিত। এবং একে একে আরও সব দেখা দিচ্ছেন। দেখা গেল, এক ওষুধে কাজ হয়েছে খুব। বাড়ি বাড়ি ধর্না দিয়ে হয় নি—নিরঞ্জনের ওই কথার উপরে বর্ষাবাদলের মধ্যে যেচে এখন সব পরোপকারে আসছেন। গুণতিতে মোট চারজন। বুড়োমানুষ যদু হালদার এসেছেন, চার তাঁকে ধরেই। এর উপরে নিরঞ্জন আছে।

শ্মশানঘাট দূর কম নয়। জলকাদার পথ। হলধর বলে, পাড়া কুড়িয়ে মোটমাট এই হল। বেশির ভাগ তো ফৌত—আর মানুষ হবে না। আমি বলি কি, চারজনে ধরাধরি করে বাইরে কোন খানে ফেলে আসি। পাড়ার মানুষ আমরা তো রক্ষে পাই। মরুকগে ভিন্ন পাড়ার লোক।

হীরু বর্ধন গর্জন করে ওঠে: বুদ্ধিটা দিলে ভাল! পাড়ায় তব নিজেদের ব্যাপার—গালিগালাজ ঝগড়াঝাঁটিতে চুকে যেত। পাড়ার বাইরে ফেলে শেষটা দাঙ্গা বেধে যাক আর কি!

বঙ্কিম দলের মধ্যে ছোট। স্ফূর্তিবাজ ছোকরা। সে বলে, চারজন তো হয়েছি। ভুগে ভুগে ওজনে আর কিছু নেই, হালকা শোলা হয়ে গেছে। নিরঞ্জনবাবুর সঙ্গে কথা হয়ে গেছে—বিশেষ ব্যবস্থা করবেন, উনি বলছেন। কাঁধ বদলাবদলি করে যেভাবে হোক নিতে হবে

শ্মশান অবধি। হীরু-কাকার কথা ঠিক, পথে কোনখানে ফেলা হবে না, হাঙ্গামা বেধে যাবে।

হলধর শিউরে উঠে বলে, শ্মশান—এই ডল্লার মধ্যে? ওরে বাবা! জামাই কতটা কি ব্যবস্থা করেছে জানি নে। তাতে কুলোবে না। ফিরে এসে নিউমোনিয়ায় ধরবে। আমাকেও এমনি কাঁধে বয়ে নিতে হবে তোমাদের।

হীরালাল গজর-গজর করে, মেয়েটা বেয়াক্কেলে। মরার দিনটা বেছেছে দেখ দিকি! ওর ঠাকুরমা গেলেন—ভাব একবার হলধর—বোশেখ মাস, আকাশ-ভরা রোদ, চারিদিক খটখটে শুকনো। ধান-চালে লোকের গোলা ভরতি, গাই বিইয়েছে ঘরে ঘরে, সুখ-শান্তি সকলের মনে। লোকও হল সেইরকম। সব কাজ সময় বুঝে করতে হয়, বুঝলে? মরাটাও।

বসে বসে আগডম-বাগডম বকে কি হবে, ব্যবস্থা করে ফেল। হুঁকো টানতে টানতে যদু হালদার তাগিদ দেন: দেরি কোরো না হে! বাবাজি, তুমি আর তক্তাপোশের ঝামেলায় যেও না—বইবে কে? হালকা দেখে বাঁশ নাও একখানা। একেবারে ফঙ্গবেনে না হয় দেখো, পথের মধ্যে ভেঙে পড়লে মুশকিলের পার থাকবে না।

হল তাই। মাদুর পাতল উঠানের উপর, তারাকে তার উপর শোয়াল। লম্বালম্বি বাঁশ একটা চাপান দিয়েছে মড়ার উপরে। দড়ি পাকাচ্ছে, বাঁধবে। ছড়ছড় করে বড় এক ছড়া বৃষ্টি এলো। কাজকর্ম ফেলে ছুটে গিয়ে সব রোয়াকে ওঠে।

সুর চলে এসেছে ও-বাড়ি থেকে। সামনের উপর আসে নি। আলাদা জাত—কি জানি কোন দোষ-দৃষ্টি হবে—গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখছে। যেমন সেই একরাত্রে লুকিয়ে দেখেছিল—গয়নাগাঁটি-পরা রাজরাজ্যেশ্বরীর মতো বিয়ের রাতের তারাকে আজকে দেখছে মাদুরের উপর শোয়ানো দু-দিনের বাসি মড়া।

বৃষ্টিতে ভিজে জবজবে হয়ে গেল যে। ওরা দেখে ফেলবে, আপন জাতের ওরা সব রয়েছে—নয়তো আমিনুর বাড়ি থেকে ছাতা এনে মড়ার উপরে ধরত।

বৃষ্টি কমলে তাড়াতাড়ি তখন শ্মশানে নেবার বন্দোবস্ত হচ্ছে। মাতুর মুড়ে কোষ্টার দড়ি দিয়ে বাঁশের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধন দিল চারটা। তারার মাথায়, গলায়, কোমরে আর ঠ্যাঙে।

আমিনুরের বুকের ভিতর আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে। অত জোরে বাঁধ কেন গো! বাঁশের গেরোয় গায়ের ছাল উঠে গেল বুঝি! কিন্তু কথা বললে তো টের পেয়ে যাবে। আবার কোন কথা উঠবে তাই নিয়ে। চোখ মেলে দেখতে পারছে না তো আমিনুর চোখ বুজল।

যত্ন হালদার বলেন, কলসির জোগাড় আছে বাবাজি?

নিরঞ্জন বলে, কুমোরবাড়ির নতুন কলসি। এখন-তখন চলছিল তো ক'দিন ধরে—যোগাড়যন্তোরে কোন খুঁত পাবেন না। আম-কাঠে পোড়ে ভাল—আমগাছ চেলা করে ডাঁই করেছি ঐ দেখুন। দড়ি কত লাগে না লাগে, কোষ্টা কিনেছি আড়াই সের—

হলধর বলে, পাঁচ কাহন কড়ি লাগবে। মড়ির সঙ্গে কড়ি দিতে হয়—কড়ি না পেলে যমদূতে বৈতরণী পার করবে না। মুখাগ্নির জন্যে আঁটি দুই নারকেল-পাতা নাও। আর ম্যাচবাক্স।

নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করে, কাঠ?

হীরালাল খিঁচিয়ে উঠল: মড়ি নেবার মানুষ হয় না, আবার কাঠ! মড়ি রেখে তবে কাঠই বয়ে নিয়ে চল।

চিতেই হবে না মোটে, কি বলেন! শ্মশানে এমনি ফেলে আসব? নিরঞ্জন অনুনয় করে বলে, কষ্ট খুব হবে মানি। কিন্তু গায়ের ব্যথা মারবার জন্য—বঙ্কিমবাবু যা বললেন, তাতেই তো রাজি হয়ে গিয়েছি।

ভূতপূর্ব শিক্ষক যত্ন হালদার এসব কথার মধ্যে থাকতে পারেন না। লিচুতলার দিকে সরে গিয়ে এক মনে তিনি তামাক টানতে লাগলেন।

তখন বঙ্কিম বোঝাচ্ছে : একজনে ধরুন কড়ি-কলসি আর নারকেল-পাতা নিল। মড়িতে কাঁধ দেবে সাকুল্যে চার জন। চারজনে হিমসিম হয়ে যাবে—কাল দেখতে পাবেন, দাগড়া-দাগড়া বাঁশের দাগ কাঁধের উপরে। এর উপরে আবার কাঠ যাবে কেমন করে? বললেই তো.হয় না!

হলধর প্রবোধ দেয়: উতলা হোয়ো না বাবাজি। মড়া পড়ে থাকবে না। শ্মশানেই কাঠ পাওয়া যাবে। মড়ির কাঠ কেউ ফিরিয়ে নিয়ে যায় না। মেয়ের কপালে থাকলে পরের কাঠে চিতে সাজিয়ে মজা করে পুড়িয়ে আসব। বরঞ্চ, একটা কুড়াল সঙ্গে নাও কাঠ কাটতে লাগবে।

হীরালাল ফ্যা-ফ্যা করে হেসে বলে, পোড়ানো না হলেও মড়া পড়ে থাকবে না। কাল গিয়ে একবার দেখো। শিয়াল-শকুনের মচ্ছব লেগে যাবে। দু-চারখানা হাড় পড়ে থাকতে পারে এদিক-সেদিক। তার বেশি নয়।

যতু হালদার তাড়া দিয়ে ওঠেন লিচুতলা থেকে: আস্তে হীরু। হাসছ কেমন করে শুনি? বয়স হয়েছে, তবু কিছু কাণ্ডজ্ঞান হল না। তারার মা-বাপ ওই ঘরের মধ্যে। দুর্গা রয়েছে।

বঙ্কিম বলে, শ্মশানে কি হয় না হয় বাড়ির উপরে কেউ কখনো বলে? পাকা লোক হয়ে মুখে কাঁচা কথা কেন কাকা?

বেকুব হয়ে হীরু বর্ধন চুপ করে গেল। গাছের আড়াল থেকে আমিনুর ছুটে পালায়। আর সে শুনতে পারে না। শ্মশানের যেখানটা বড়গিন্নিকে সমারোহে পুড়িয়েছিল, তারার দেহ ফেলে আসবে সেই জায়গায়? শকুনেরা ঘিরেছে চতুর্দিকে—পেট ফেড়ে ফেলেছে, নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। ভাসা-ভাসা তারার চোখ দুটোয় কাকে এসে ঠোক্কর দিচ্ছে। হাত পা ছেঁড়াছেঁড়ি করছে শিয়ালে—খ্যা-খ্যা আওয়াজ তুলে শিয়ালে শিয়ালে ঝগড়া লেগেছে খখরা নিয়ে। নুর আর ভেবে উঠতে পারে না।

বল হরি, হরিবোল—

মড়ার মাথা ও পায়ের দিকে বাঁশের খানিকটা বেরিয়ে আছে। চারজনে কাঁধে নিয়ে রাস্তা দিয়ে চলল। এক হাতে কলসি আর আর এক হাতে নারকেল-পাতার আঁটি নিয়ে নিরঞ্জন চলেছে পিছন পিছন।

বল হরি, হরিবোল—

জবেদ ঘরের দরজায় খিল এঁটে দিয়েছে। আয়েসাও ঘরের মধ্যে। সমাজে তারা একঘরে—গরুর গাড়িতে হিঁদু বয়ে আনার জন্যে। সেই আগেকার একফোঁটা তারা কিন্তু এত সব ছিল না—বড় হয়ে আর দেশের হালচাল পালটে গিয়ে তারা হিঁদু হয়ে গেছে। রোগা হিঁদু মেয়েটাকে স্টেশন থেকে নিয়ে আসা বিষম অপরাধ। একঘরে না হলে জবেদ আজকে পাড়া ছেড়ে অন্য কারো বাড়ি গিয়ে উঠত—শ্মশানযাত্রা দেখতে না হয়, সেজন্য দরজা দিয়ে থাকতে হত না। দরজা দিয়ে হয়তো বা দু-হাতে কান চেপে আছে, হরিধ্বনি কানে না যায়।

আমিনুরের সুবিধা হয়ে গেল। চুপিসারে সে সোনাকে গোয়াল থেকে বের করল। মড়া বেরিয়ে গিয়ে ডাক্তারবাড়ি একেবারে নিঃশব্দ। নির্মলা আর গোপেশ্বর ঘরের ভিতর এমন চুপচাপ—অচেতন হয়ে আছেন, নয়তো মরেই গেছেন একেবারে। গোপেশ্বরের সঙ্গে ওই কথাবার্তার পরে দুর্গারও কোন সাড়াশব্দ মেলে নি। আছে কি নেই, কেউ টের পাওয়া যায় না। চেলা-করা আমকাঠ আমিনুর ডাক্তারবাড়ি থেকে চোরের মতন বয়ে বয়ে আনছে। কাঁঠালগাছে উঠে গুলঞ্চলতা ছিঁড়ে নিয়ে এলো। লতা দিয়ে কাঠের আঁটি বেঁধে সোনার পিঠে ঝুলিয়ে দিল দু-পাশে।

চল রে সোনা, যাবি? আব্বার সঙ্গে গিয়ে সেই যেমন বড়গিন্নির কাঠ দিয়ে এসেছিলি। বাড়িতে কত কাঠ বানিয়ে রেখেছে—আর তারাকে ওরা শিয়াল-শকুন দিয়ে খাওয়াবে। যাবি নে?

খানিক দূর এগিয়ে রাস্তা ছেড়ে মাঠে নামল : গোলদারের চোখ বন-বন করে ঘুরছে রে সোনা। ধরে ফেললে রক্ষে নেই। লুকিয়ে-চুরিয়ে যেতে হবে। মাঠ ভেঙে আমি আর তারা গিয়েছিলাম বড়গিন্নির মরার দিন। আজকে তুই আর আমি। তারা পারল, আমি পারলাম—তুই কেন পারবি নে সোনা ?

বল হরি, হরিবোল—

মড়া নামাল বেগীর শ্মশানে। বেগী নদী নয়, খালও নয়—ডোবা মতন জায়গা। খালের একটা রেখা গিয়েছে এদিক-ওদিকে, বর্ষাকালে সামান্য স্রোত চলে। কোনকালে নাকি নদী ছিল—সাধু নাম বেগবতী, জোয়ারে উচ্ছল হত, ভাঁটায় কিছু ঝিমিয়ে পড়ত। তটের উপর সন্ন্যাসী ধ্যানে বসেছিলেন—খলখল করে কলহাস্যে বেগবতী তাঁর কমণ্ডলু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ক্রুদ্ধ সন্ন্যাসী অভিশাপ দিলেন, জোয়ারের জল সেই থেকে আর আসে না। নদী মজে হেজে গিয়ে ডাঙা। ধানের ক্ষেত, কত জায়গায় পুকুর কেটে মাটি তুলে লোকে তার উপর ঘরবাড়ি তুলেছে। মাঝে মাঝে খানাখন্দ হয়ে জল জমে থাকে—যেমন ঝুরি-নামা প্রাচীন বটগাছের নিচে শ্মশানঘাটের এই জায়গাটুকু।

বটতলায় নামাল তারাকে। বৃষ্টি আসছে এক-একবার, গাছের নিচে খানিকটা তবু আচ্ছাদন। যদু হালদার ব্যস্ত হয়ে পথের দিকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছেন : কই গো, নিরঞ্জনের যে দেখা নেই ! অত পিছিয়ে পড়ল কেমন করে ?

হীরু বর্ধন হেসে উঠে বলে, সরে পড়ল কিনা তাই দেখ। সোজা হয়তো স্টেশনের পথ ধরেছে। ওর কাণ্ডবাণ্ড অজানা নেই কারো কাছে। তারার এখন-তখন বুঝে ছুর্গাটা আবার চেপে এসে পড়ল। শ্মশানের পথে পালাবার এই মওকা। বয়স আছে, চেহারা আছে—

টোপর পরে কোনখানে গিয়ে আবার ছাদনাতলায় বসবে। তিন নম্বরের বউ আনবে।

বাজে কথা কানে না নিয়ে যদু বললেন, কী আশ্চর্য, এত দেরি হবার তো কথা নয়! হলধর দেখ দিকি, বাঁশ-টাশ পড়ে আছে কিনা এদিক-ওদিক। না পাওয়া গেলে কী আর হবে—যে বাঁশে মড়ি বয়ে এনেছি, সেইখানা কেটেকুটে কাজ চুকিয়ে দাও।

বয়সে ছোট বলে বেশি খাটনির কাজগুলো বঙ্কিমের। যদু হালদার তাকে বলেন, কুড়ুল ধরে ঝটপট বাঁশখানা ফেড়ে ফেল। ওই দিয়ে সারতে হবে। রোগা ডিগডিগে মেয়ে—কাপা এক গণ্ডার বেশি লাগবে না। হীরু কি বলছ, হবে না এক গণ্ডায়?

বাঁশের একদিকে খানিকটা ফেড়ে ফেলে ভিতরে গোঁজ-ঢুকিয়ে দিয়ে কাপা বানায়। চিমটার মতো। মড়া যেখানে ভাল পোড়ানো হল না সেই ক্ষেত্রে কাপার প্রয়োজন। মড়া জলে ফেলে ঐ কাপার চিমটা দেহের এখানে ওখানে লাগিয়ে কুড়ালের পিছন দিয়ে ঘা মেরে মেরে মাটিতে .বসায়। ভেসে উঠলে শিয়ালে টেনেহিঁচড়ে ডাঙায় তুলে ফেলে—সেইজন্য কাপার ব্যবস্থা। কাপার শৃঙ্খলে মাটির সঙ্গে সেঁটে থাকে মড়া। কিন্তু শিয়ালও সেয়ানা হয়েছে—জলের ভিতর মুখ ডুবিয়ে মড়া টানাটানি করে। তবে সহজে সেটা হয় না।

নিরঞ্জনকে দেখা গেল অবশেষে। পা পিছলে পড়েছিল নাকি পথের উপর—তবু ভাল যে হাতের কলসি উঁচু করে ধরেছিল—কলসিটা ভাঙে নি। পগারে হাত-পা ধুয়ে আসতে হল, তাই একটু দেরি। মুখ টিপে হাসে সকলে। অপর কিছুও হতে পারে। যে রকম গদগদ অবস্থা, নিশ্চয় সেই ব্যাপার। শ্মশানবন্ধুদের গায়ের ব্যথা মারবার জন্য বঙ্কিমের সঙ্গে যে কথাবার্তা হয়েছে, নিরঞ্জন সেই দাওয়াই সর্বাগ্রে নিজের উপর পরখ করে এলো। বর্ষাবাদলের

দিনে অবস্থা বুঝে শিশিতে করে এনেছিল, মুখে ঢেলে শিশিটা পগারের জলে ফেলে দিয়েছে।

সকলে তাড়াতাড়ি করছে: মড়ি চান করিয়ে দাও হে জামাই। জল ভরে কলসি দুই-চার ঢেলে দাও, ব্যস। তোমাকেই করতে হয়।

মুখাগ্নি করবে এসো নিরঞ্জন। নারকেল-পাতা নিয়ে এসো। পাতা ধরিয়ে তারার মুখে ছোঁয়াবে। তুমিই সব করবে।

নিরঞ্জন বলে, শ্মশানে কাঠকুটো আছে বলেছিলেন যে খুড়ো মশায়? কোথায়? হায় হায়, সোনার তারাকে শেষটা কি কাঁচা অবস্থায় শিয়ালের মুখে দিয়ে যেতে হবে?

বলতে বলতে একেবারে ডুকরে কেঁদে ওঠে।

যদু বললেন, কাঠ অন্য সময় তো পড়ে থাকে। আজকেই দেখছি, কে যেন ঝাঁটপাট দিয়ে সাফাই করে গেছে। তারার কপাল! তা ছাড়া আর কি বলি? কিংবা নিজেই হয়তো পুড়তে চাচ্ছে না। নইলে এমনধারা হবে কেন? তুমি মুখাগ্নি কর বাবাজি, তাইতে হবে। শাঁখা-সিঁদূর নিয়ে স্বামীর হাতের আগুন পাচ্ছে, এই বা ক'জনের ভাগ্যে হয়!

হলধর বলে, ম্যাচবাক্স দাও জামাই, পাতা ধরিয়ে দিই।

কান্না থামিয়ে নিরঞ্জন জিভ কাটল: এই যাঃ—

কি হল?

ম্যাচবাক্স কলসির মধ্যে ছিল। কলসির ভিতরে করে নিয়ে এলাম —নতুন কলসি, গরমে থাকবে, বৃষ্টি লাগবে না। যখন চানের জল তুলি, সে ঘোড়ার ডিম জলের মধ্যে পড়ে গেছে।

তবে? কারো কাছে ম্যাচ নেই। তুমি এনেছ, অপরে কি জন্যে আনতে যাবে? শ্মশান-ঘোরা জিনিস বাড়ি ফেরত নেওয়া যাবে না। ম্যাচবাক্সের দামও হয়েছে চার পয়সা করে।

হলধর বলে, কাঠের জন্য তড়পাচ্ছিলে জামাই, বোঝ এইবারে।

তারা চায় না আগুনে দেওয়া হোক তাকে। মুখেও আগুন ছোঁয়াতে দেবে না। চিরকালের একগুঁয়ে—এইটুকু বয়স থেকে দেখে আসছি আমরা। মরেছেও শনিবারের দিন তিন-পো দোষ পেয়ে।

রাত্রিবেলা, বিদ্যুৎ-চমক, ব্যাঙের ডাক, ঝুপঝুপে বৃষ্টি, ঝুরি-নামা অন্ধকার বটতলা—শ্মশানবন্ধু সকলের বুকের মধ্যে গুরগুর করে। কাজকর্ম সেরে সুভালাভালি বাড়ি ফিরতে পারলে রক্ষা পায়। তাড়াতাড়ি করো হে—মড়া নামিয়ে দাও জলের মধ্যে।

নিরঞ্জন দু-হাত তুলে ছুটে আসে : রাখ, রাখ—। অস্থির কি হবে খুড়োমশায় ? এদিকে কিছু হল না, অস্থি নিয়ে আমি নিজে কলকাতায় যাব। গঙ্গাজলে দিয়ে সোনার তারার গতি করে আসব।

হতবুদ্ধির মতো যদু বলেন, পুড়ল না যে মোটে ! অস্থি কোথায় পাবে ?

হলধর বলে, কাণ্ডটা ঘটালে তুমিই ম্যাচবাক্স জলে ফেলে দিয়ে। আবার এখন অস্থির আবদার ! সরো, সরো, কাজ সারতে দাও। গরু মেরে জুতো-দানের কথা বল কোন মুখে ?

হীরু বর্ধন বলে, বাজে ফ্যাচ-ফ্যাচ করছ তোমরা। অস্থি মানে তো হাড়। আস্ত মানুষটাই রয়েছে, অস্থির কোন অভাব আছে ?

কেউ কিছু বোঝবার আগেই কুড়াল নিয়ে মড়ার আঙুলে কোপ দিল জোরে। কড়ে-আঙুলের একটুকরো কেটে ছিটকে পড়ল। বলে, শামুক এনে ভরে নাও।

বলো হরি, হরিবোল—

তারাকে জলে ফেলে কাপায় সেঁটে দিয়েছে। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে। ভেসে উঠবার জো রইল না। সংক্ষেপে কাজ চুকল। চল এইবারে—ফিরে চল।

সবাই আগে যাবে, পিছনে কেউ থাকবে না। আগে কাটিয়ে উঠবার জন্য হুড়োহুড়ি। সকলের শক্তি সমান নয়, কেউ পিছিয়ে পড়ল তো

দৌড়চ্ছে সেই লোক। কে বুঝি ঝাপটে ধরবে পিছন থেকে এসে। গণে দেখছে মাঝে মাঝে—পাঁচজন তারা, এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়—

অ্যাঁ, ছয় হচ্ছে তবে কেন? মানুষ বেড়ে যাওয়া ভাল কথা নয়। শনিবারের দোষ-পাওয়া মড়া—জলতল থেকে উঠে সে-ও বাড়ি ফিরছে নাকি এক সঙ্গে? তাই তো! এক—দুই—তিন—চার—পাঁচ—বাড়তি লোকটা কে হল—কে তুই?

কাঁপা গলায় আমিনুর বলে, আমি গো, আমি। হয়ে গেল তোমাদের? এর মধ্যে শেষ হল?

বাচ্চা ছেলে এদ্দূরে কেন রে তুই?

সোনাকে পাওয়া যাচ্ছিল না। খুঁজতে খুঁজতে এসে পড়লাম। ঐ যে সোনা।

মাঠ ভেঙে আসছিল। এদের ফিরতে দেখে গরু রেখে নুর একলা দৌড়ে পথের উপর এসেছে। সোনার পিঠে কাঠ, হলধর দেখতে পেল। এই বুঝি এক নতুন ফ্যাসাদ বেধে যায়। নিরঞ্জনের মেজাজ এখন অতিমাত্রায় আর্দ্র। কাঠ নজরে পড়লে হাউহাউ করে কেঁদে ভাসাবে। নেশার মুখে কিছুই অসম্ভব নয় এখন। সকলকে দাঁড় করিয়ে রেখে ম্যাচবাক্স আনতে ছুটবে বাড়ি অবধি। কাঠ যখন এসেছে, পুড়িয়ে শেষ না করে ছাড়বে না। হাতে ধরবে, পা জড়িয়ে ধরবে। তার মানে সমস্ত রাত্রির ধাক্কা।

হলধর গর্জন করে উঠল: সমাজে তো একঘরে করে দিয়েছে। আবার কি জন্যে ঘুরঘুর করিস আমাদের মধ্যে? বাড়ি চলে যা—

গলা নিচু করে বলে, ছোঁড়া পাজির পা-ঝাড়া। গরু হারানো মিছে কথা, চরবৃত্তি করতে এসেছে। দেখে গিয়ে গাঁয়ের ভিতর চাউর করে দেবে। হাসাহাসি করবে ওদের জাতজ্ঞাত সকলে।

বল হরি, হরিবোল—

শ্মশানবন্ধুরা গ্রামে ফিরল। পুকুরে নেমে ডুব দিচ্ছে। দেখা গেল, ঐ রাত্রে দুর্গা খরখর করে ঘাটের উপর চলে এসেছে। লোহা আর সদ্য-ভাঙা নিমের ডাল একটা হাতে। স্নান করে তেতো জিনিস দাঁতে কেটে লোহা স্পর্শ করে তবে সকলে বাড়ি ঢুকবে। মায়ার বশে বিদেহী আত্মা যদি সঙ্গ নিয়ে থাকে, এইসব প্রক্রিয়ায় পালাবার দিশা পাবে না।

ঘরের মধ্যে নির্মলা অচেতন হয়ে পড়েছিলেন। পাখা করা, জলের ঝাপটা দেওয়া, এ সমস্ত কিছুই নয়—স্ত্রীর দিকে গোপেশ্বর নজর মেলে ঝিম হয়ে ছিলেন। হরিধ্বনি শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন নির্মলা। সেই থেকে বুক চাপড়াচ্ছেন, কপাল ভাঙছেন : মাগো আমার, তুই যে বড্ড ছেলেমানুষ, কোনখানে তোকে বিদেয় করে এলো—

সামলে উঠলে যে, কী মুশকিল! তিক্ত বিকৃত কণ্ঠে গোপেশ্বর নির্মলাকে বলছেন, ভাবলাম তুমিও যাচ্ছ—বখেড়া মিটে গেল। একা মানুষ হাত-পা ঝাড়া হয়ে বেরুনো যাবে। তা-ও দেখি হয় না।

বাড়ি ঢুকে শাশুড়ির আর্তনাদ শুনে নিরঞ্জন সেই দিকে যাচ্ছিল। দুর্গা এসে যেন ছোঁ মেরে ধরে : ওদিকে কি তোমার? এসো—। হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল যে ঘরে পুরানো হাঙর-মুখো খাটের উপর তারার বিছানা ছিল। রোগির বিছানা ফেলে কোথা থেকে আলাদা তোষক এনে দুর্গা পেতে ফেলেছে। তোষকের উপর ধবধবে পাট-ভাঙা চাদর। চাদরের উপর বালিশ দুটো।

দুর্গা বলে, কি খাবে বল—ভাত না রুটি? দুই রকমই করে রেখেছি।

আর ওদিকে সোনার দড়ি ধরে আমিনুর গোয়ালের ধারে এলো চুপিসারে ঝাঁপ খুলে গরুটা গোয়ালে ঢোকাবে। জবেদ টের পাবে

না, ভেবেছিল। কিন্তু ছেলেকে না দেখে উদ্বেগে জবেদ ইতিমধ্যে অনেকবার খোঁজাখুঁজি করেছে। গোয়ালঘরে সোনাও নেই, তখন আন্দাজ করেছে এমনি ধরনের কিছু। দুর্যোগের রাত্রে তা-বড় তা-বড় জোয়ানপুরুষ ঘরের মধ্যে কাঁথা জড়িয়ে আছে—সাহস বোঝ ওইটুকু ছেলের।

তক্কে তক্কে ছিল জবেদ, লাঠি হাতে এসে পড়ল এক দৈত্যের মতো। দমাদম মারছে: শয়তান হারামির বাচ্চা, কেন বেরিয়েছিলি?

সোনা দাঁড়িয়ে—অপরাধ তারও যেন। গরু মাঝখানে এসে মার রোখে। আমিনুর ঘুরছে সোনাকে ঘিরে। লাঠি পড়ছে সোনার পিঠেও। সোনা আছে তাই অনেক বাঁচোয়া। ছেলে আর গরু পিটিয়ে রাগের শোধ দিয়ে জবেদ আবার ঘরে চলে গেল।

অনেক কাল আগে সোনার মা বুধি বাঁধা ছিল এই কাঁঠাল-তলায়। সোনার জন্মের সেই দিন। তারাও ছিল। তারা, তুই জানিস নে—ভুল বলেছিলি। গরু কথা বলে না নাকি লোভের পাপে?

বাপের পিটুনি খেয়ে নুর কাঁদে নি। এতক্ষণে হু-হু করে দু-চোখে জল নামল। অলক্ষ্য অন্ধকারের দিকে চেয়ে কেঁদে কেঁদে সে বলছে, তুই মিথ্যে বলেছিলি তারা। গরু কথা বলে না ঘেন্না করে। মানুষের বজ্জাতি দেখে। মানুষ যদি কোন দিন ভাল হয়, তখন দেখিস এই গরু কথা বলে উঠবে।

এই লেখকের

মানুষ নামক জন্তু

রোমান্স হাসিরহস্য-অমায়িকতা—সভ্যতার মাজাঘষা নানান চেহারা। সঙ্কট-মুহূর্তে হঠাৎ সমস্ত ঝরে পড়ে, মানুষ-জন্তুর আসল মূর্তি বেরোয়। হিংস্র আর স্বার্থান্ধ, বীভৎস আর পৈশাচিক। মহৎ শিল্পীর নৈর্ব্যক্তিক লেখনীতে কঠিন বিচিত্র চরিত্রের অপরূপ উদ্ঘাটন।

রক্তের বদলে রক্ত

হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা চলছে লাহোর ও কলকাতায়। চিরকালের চেনা মানুষের একেবারে ভিন্ন রূপ। দুনিয়া টলছে, পা রাখি কোথায়? সেই রক্তাক্ত দিনের নৃশংস ছবি। কিন্তু নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুদ্দীপ্তি—মানুষ ভালো, মানুষ সুন্দর, আশা ও বিশ্বাস রাখ জীবনের উপর। বাজিকরের দড়ির উপর দিয়ে চলার মতো শক্তিধর লেখনীর সৃষ্টি এই অনন্য উপন্যাস।

ভুলি নাই

বাঙলা দেশের রাজনীতির রুক্ষকঠিন শরীরেও যখন রোমান্টিক আদর্শবাদের একটি অপরূপ স্পর্শ লেগেছিল—সে হল অগ্নিযুগের কথা। সেই মহাযুগের মৃত্যুঞ্জয় সাধনাকে ভিত্তি করে একখানি অসাধারণ গ্রন্থ। শরৎচন্দ্রের পরে সর্বাধিক জনপ্রিয় উপন্যাস।

সৈনিক

সৈনিক পান্নালাল। দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ বাঙলায় কারামুক্ত হয়ে এক মুহূর্ত তার বিশ্রাম মিলল না। বিপ্লব, দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল সৈনিক যতদিন না আবার কারাপ্রাচীর সাময়িকভাবে তার গতিরোধ করল। সৈনিককে ঘিরে যে সমাজ, যার জন্যে তার সংগ্রাম, কুশলী লেখকের কলম তাকে নিঃশঙ্কভাবে উদ্ঘাটিত করেছে।

আগস্ট, ১৯৪২

স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে '৪২-এর আগস্ট-আন্দোলন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে। সেই আন্দোলনের আবর্তে অগণিত জনগণের আত্মত্যাগপূত এই

কাহিনী। তারই সঙ্গে রয়েছে সরকারি চাকুরিজীবী স্বামীর সঙ্গে স্বাধীনতা-সংগ্রামী স্ত্রীর নিরন্তর দ্বন্দ্ব, এবং মধুর মিলনান্ত উপাখ্যান।

বাঁশের কেল্লা

বাঙলার বিপ্লব-ঐতিহ্য অতি-পুরানো। নীলবিদ্রোহ থেকে বিয়াল্লিশের অগ্নিক্ষরা বিপ্লব অবধি কাহিনীর পরিক্রমা। এই উপন্যাসে ঐতিহাসিকের তথ্যানুসন্ধানী দৃষ্টির সঙ্গে কবির বৃহত্তর সত্যদৃষ্টির মিলন ঘটেছে।

নবীন যাত্রা

গ্রামোন্নয়নে নামবার আগে গ্রামকে চিনতে হয়, চিনতে হয় গ্রামে-গ্রামে ছড়ানো দেশের রূপটিকে।

বুনিয়াদী শিক্ষাদর্শের সার্থক সাহিত্যায়ন। লেখকের বহুমুখী প্রতিভার অত্যাশ্চর্য নিদর্শন। নয়া-দিল্লীর 'সস্তা সাহিত্য সংস্থা' বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসাবে এর হিন্দি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন।

বৃষ্টি, বৃষ্টি,

রাজনৈতিক প্রবঞ্চনার সঙ্গে সংঘাত বাধল—ফলে সুস্থির থাকতে দিল না ইতিহাসের শান্তিকামী সাধককে। তারই সঙ্গে দুটি চরিত্রের নিভৃতচারী নিবিড় অনুরাগ। বহু চরিত্রের সমাগমে, বহুবিধ ঘটনার জটিলতায় অবশেষে কাহিনী মিলনের সমুদ্রসঙ্গমে এসে সুস্নাত শান্তি লাভ করল।

বকুল

জীবনের দেনা আর যৌবনের দাবি অমরেশ-জয়ন্তীর দাম্পত্য জীবনে যখন জটিল সংঘাতের সৃষ্টি করেছে, অমরেশের প্রথমা স্ত্রীর শিশুপুত্র বকুলের সেই সময় অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব। সমস্ত কাহিনীর মোড় ঘুরে গেল এই বকুলকে কেন্দ্র করে। কোথায় ছিল সে এতদিন!

এক বিহঙ্গী

আকাশচারী এক বিহঙ্গ যেন স্বপনপশারী সেই মেয়ে। সমস্ত দৈনন্দিনতার ঊর্ধ্বে বিকশিত তার হৃদয়ের শতদল। তরুণ-তরুণীর মন-দেওয়া-নেওয়ার কাহিনী-গ্রন্থনে লেখক অনন্যসাধারণ। তারই স্মরণীয় উদাহরণ এক বিহঙ্গী।

জলজঙ্গল

সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলের হাসি-কান্না আর সংগ্রামের কাহিনী। মাটি জল আর মানুষ একাকার হয়ে গেছে এই উপন্যাসে। জল ও জঙ্গল—তারাও জীবন্ত মানুষের পাশাপাশি চরিত্র হয়ে ফুটেছে। এ হেন উপন্যাস শুধু বাংলা সাহিত্যে কেন, পৃথিবীর যে-কোনও সাহিত্যের গৌরব।

শত্রুপক্ষের মেয়ে

সুন্দরবনের প্রত্যন্ত প্রদেশে দক্ষিণ-বাংলার নদীবহুল বসতি-বিরল অঞ্চলে উদ্যোগী শক্তিমান পুরুষের দিন তখনও যায় নি। তাদের সুখ-দুঃখ নিয়ে মরমী লেখক যে কাহিনী রচনা করেছেন তা রূপকথার চেয়েও বিস্ময়কর।

ওগো বধূ সুন্দরী

বসন্ত গান-পাগলা মানুষ। সংসারের বন্ধন এড়িয়ে যেতে তার সমস্ত প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত কেমন করে ব্যর্থ হল, তারই কৌতুকস্নিগ্ধ মনোরম কাহিনী। অনুপম দৃশ্য প্রচ্ছদপটে উপহারের শ্রেষ্ঠ রুচিসম্মত বই।

সবুজ চিঠি

নাম, যশ, অর্থ এবং প্রতিপত্তি—এই কি জীবনের চরম লক্ষ্য? দয়িতার প্রেম, সন্তানের মায়া, আপন গৃহের ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশ—সব ছেড়ে গিয়ে খ্যাতির তপস্যায় জয়ী হয়েও তাই পুরুষসিংহের জীবনের দাবদাহ মিটল না। মানব-মনের একটি দুজ্ঞেয় রহস্যের আশ্চর্য উন্মোচন ঘটেছে এই উপন্যাসে।

আমার ফাঁসি হল

পরম শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু এই উপন্যাস সম্বন্ধে বলেছেন—"আপনি একেবারে নূতন রকম একটি সৃষ্টি করেছেন। অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত নব রসের মধ্যে ভয়ানক আর বীভৎস রস লেখকরা পরিহার করে থাকেন।...আপনার গল্পটির প্রধান অবলম্বন ভয়ানক রস, তার সঙ্গে জল আর জঙ্গলের পরিবেশও আছে। সব সুদ্ধ মিশে গল্পটি মোহময় রহস্যময় অদ্ভুত এবং চমৎকার হয়েছে।"

মনোজ বসুর গল্প-সংগ্রহ

মনোজ বসুর বিচিত্রমুখী ও লীলাকুশলী শিল্পদৃষ্টির পরিচয় গল্পগুলিতে। গীতি-কবিতার মোহ ও রোমান্সরসের বর্ণবিচিত্র সমারোহের সঙ্গে মিশেছে বুদ্ধিধর্মী বিশ্লেষণ ও বাস্তব-ঘনিষ্ঠ জীবন-প্রজ্ঞা। তাই তাঁর কল্পদৃষ্টি যেমন বনমর্মরের

নিগূঢ় রহস্যজিজ্ঞাসায় অধীর, তেমনি জীবনের ক্ষণদীপ্ত খদ্যোত-মুহূর্তগুলিরও তিনি নিপুণ ভাষ্যকার। একদিকে ঐশ্বর্যদীপ্ত অলঙ্কৃত ভাষায় রাজকীয় উৎসব, আর একদিকে স্বল্পসঙ্কেত সূক্ষ্ম রূপকরণের লঘুলীলা। 'বনমর্মর' ও 'খদ্যোত' পুরা দুইখানা বই ছাড়াও অতিরিক্ত গল্প 'স্বয়ম্বরা'। অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায়ের সুদীর্ঘ ভূমিকা।

বনমর্মর

বাংলার মাঠ-নদী বন আর তার সঙ্গে একাত্ম মানুষগুলির সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন থেকে তুলে নেওয়া কান্না-হাসি-বিরহ-মিলনের আলোছায়ায় স্নিগ্ধ-মধুর গল্পের সংকলন। রেখায়-রেখায় উন্মোচিত মানব-মনের নতুন দিগন্ত।

খদ্যোত

ছোট গল্প গল্পও হবে, ছোটও হবে—প্রমথ চৌধুরীর এই অভিমত আজ সর্বজনবিদিত। কিন্তু অত্যন্ত দুরূহ এই শিল্পকর্ম। বাহুল্যবর্জিত ঘটনা-পরম্পরায় একটি মূল চরিত্র কি একটি বিশেষ বক্তব্যকে অতুলন নিষ্ঠায় তুলে ধরা হয়েছে।

উলু

"ছোটখাটো ট্রাজেডি যাহা একটি অখ্যাত মানুষকে বা তাহার পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরে ঘটে তাহার রূপ আমাদিগকে অভিভূত করে। উলু এই রকম অভিভূতকরা ট্রাজেডি গল্প।"

দিল্লি অনেক দূর

স্বাধীনতা পেয়েছি—কত সাধ আর স্বপ্নের স্বাধীনতা! দিল্লি তবু অনেক দূরে রয়ে গেল এখনো। স্বাধীন জনগণের বেদনা-আনন্দ ও অবসাদ-প্রত্যাশার নানা কাহিনী। বাংলা গল্পের পরিক্রমা ক্ষেত্রবিশেষে নিরুদ্ধ নেই—এই গ্রন্থ তার বিস্ময়কর নিদর্শন।

দুঃখ-নিশার শেষে

অন্যের লেখার দু-এক ছত্র উদ্ধৃতি দিলেই হবে: শনিবারের চিঠি বলেন 'বর্তমান গল্প-সংগ্রহে মনোজ বসুর আধুনিক দৃষ্টির চরম বিকাশ পরিলক্ষিত হইল।' অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন 'Will be gratefully remembered as herbinger of a new intellectual order'

পৃথিবী কাদের

নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে কোন মেজাজের গল্পের সংকলন। অমৃতবাজার বলেছিলেন 'It is a departure in the fiction literature of the Province'

কুঙ্কুম

বাইশটি অতি-ছোট এবং মাঝারি গল্পের এই সংকলনটি বিষয়-বৈচিত্র্যে শুধু নয়, পরিহাসস্নিগ্ধ প্রশান্ত শিল্পদৃষ্টির উদ্ভাসনেও বিশিষ্ট হয়ে থাকবে। মানুষের অন্তর্জগতের বহুতর রহস্যের আশ্চর্য বাণীরূপ।

কিংশুক

শুধু মন-দেওয়া-নেওয়ার মিষ্টি উপাখ্যান নয়, তারই সমান্তরাল ভাবে তুলে ধরা হয়েছে তথাকথিত দেশনেতার ভণ্ডামির অবিকল চিত্র, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ভাড়াটে সৈনিকের অন্তিম পরিণামের মর্মন্তুদ কাহিনী। বিচিত্র রসের স্মরণীয় চোদ্দটি অতি-ছোট ও মাঝারি গল্প।

নরবাঁধ

সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের দুটি গল্পের গ্রন্থন নরবাঁধ। এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে মোহিতলাল '...ঐ দুইটি গল্প যিনি লিখিয়াছেন, তিনি, তিনি আর কিছুই লিখুন বা না লিখুন, কেবল ঐ দুইটির জন্য বাঙলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের চত্বরে স্থায়ী আসন লাভ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সে আসন অতি অল্প কয়েকজনই দাবি করিতে পারেন।'

দেবী কিশোরী

চেনা মানুষ আর তার চেনা কতকগুলি স্বাভাবিক বৃত্তি ; প্রেম স্নেহ, আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ ইত্যাদির মধ্যেই তাঁর শিল্পীমানসের ভিত্তি দৃঢ়মূল। 'দেবী কিশোরী'র গল্পগুচ্ছে এই সত্যেরই আলো প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে।

একদা নিশীথ-কালে

ন-টি সরস গল্পের সংকলন 'একদা নিশীথকালে'। এক শান্ত গভীর জীবনবোধ থেকে উৎসারিত অপরূপ স্বাদের বিচিত্র এই গল্প ক'টিতে মনোজ বসুর শিল্পীসত্তার সম্পূর্ণ নতুন পর্যায়ের উন্মোচন ঘটেছে। কৌতুকস্নিগ্ধ এক আশ্চর্য পরিহাসের আভায় গল্পগুলি উজ্জ্বল।

কাচের আকাশ

পরিবেশ রচনায় অসামান্য দক্ষতায় এবং তার মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলিকে সজীব করে তোলার দুর্লভ ক্ষমতায় এই লেখক প্রায় তুলনারহিত। প্রতিটি গল্পেই সংবেদনশীল কথাকারের মমতার স্পর্শ তথা মানবিক-বোধ অন্তর্লীন।

মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প

বাছাই-করা কতকগুলি গল্পের সংকলন। এই একখানা বইয়ের ভিতরেই মনোজ বসুর আশ্চর্য সৃষ্টিবৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যাবে। লেখকের জীবন-কথা, ছবি এবং অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের রসসমৃদ্ধ ভূমিকা বইয়ের মর্যাদা বাড়িয়েছে।

সোবিয়েতের দেশে দেশে

'মনোজ বাবুর সোবিয়েতের দেশে দেশে আমাদের মত গৃহকোণে আবদ্ধ জীবদের ভ্রমণের পিপাসা মেটায়, বৈঠকী গল্পের ক্ষুধা মেটায়, প্রচণ্ড বিতর্ক ও কৌতূহলের বস্তু সোবিয়েত দেশ সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য জানিয়ে দেয়।...বুঝা যায় সোবিয়েত দেশ, অন্ধকার পাতালপুরীও নয়, দিব্যধাম স্বর্গও নয়—অন্ধকার পাতালপুরী থেকে উদ্ধার পেয়ে নতুন জগৎ ও জীবন নির্মাণরত একটি বিচিত্র ও বিপুল মানবগোষ্ঠী।' —স্বাধীনতা

চীন দেখে এলাম

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব

১৯৫২-৫৪ তিন বছরের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-পুস্তক হিসাবে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিংহ দাস পুরস্কার-প্রাপ্ত। 'ভ্রমণের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে তিনি সাহিত্যের রসে স্নিগ্ধ করে নিয়েছেন ; মাধুর্যময় ভঙ্গিতে তার একটা আনুপূর্বিক বর্ণনা দিয়েছেন। সে বর্ণনা সুন্দর, রসোত্তীর্ণ। লেখকের পরিহাস-রসোজ্জ্বল চিত্তেরস্পর্শে তা আরও মাধুর্যময় হয়েছে।'

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

নতুন ইয়োরোপ ঃ নতুন মানুষ

'জর্মন আকাদেমি অব আর্টস' থেকে চার জন ভারতীয় লেখক নিমন্ত্রিত হন। লেখক সেই দলের একজন।

বার্লিন শহর শুধু নয়, জর্মন দেশের অভ্যন্তরে হাজার হাজার মাইল তাঁরা ঘুরেছেন। ভারতের খুব কম লেখকই গেছেন সে-সব জায়গায়।

ইয়োরোপে না গিয়েও আপনি চোখের উপর যুদ্ধোত্তর ইউরোপ দেখতে পাবেন। শুধু মাত্র কলমের ছবিই নয়, দুর্লভ ফটোচিত্রও অনেক সে সব ছবি বিশেষ করে এই বইয়ের জন্য তুলে আনা হয়েছে।

পথ চলি

ডাঙার পথ, জলের পথ, আর আকাশ-পথ। নগণ্য গ্রাম-জীবন থেকে শুরু করে অর্ধেক দুনিয়া লেখকের পায়ের তলায়। কত মানুষ, কী বিচিত্র অভিজ্ঞতা! যেন আসর সাজিয়ে বসে মনোরম ভঙ্গিতে বলে যাচ্ছেন—রাম্যরচনা, ভ্রমণকথা, স্মৃতিচিত্র, কাহিনী-প্রচয়—সমস্ত কিছু মিলিয়ে এক পরমাশ্চর্য সৃষ্টি।

নূতন প্রভাত

পরাধীনতার পাপ যখন ভারতীয় জাতিচরিত্র কলুষিত করতে উদ্যত, তখনই যুগসঞ্চিত পুণ্যের ফলে যুবশক্তি জেগে উঠে অজ্ঞানতার কুয়াশা মোচন করে জাতির জাগরণ ঘটিয়েছিল। তেমনি একদল আলোকবাহী তরুণ-তরুণীর সংগ্রাম, দুঃখবরণ, আকাঙ্ক্ষা ওবিশ্বাসের তীব্র নাটকীয় প্রতিফলন।

বিপর্যয়

হিরণ্ময় চৌধুরির বুদ্ধি ও মেধা ছিল অসাধারণ, আর ছিল অদম্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা। কিন্তু আর কিছু ছিল না। না, ছিল—ছিল সুনাম। তাই সে বিক্রি করল। খ্যাতি ও প্রতিপত্তি মিলল। কিন্তু ততদিনে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে শান্তি ও আনন্দের সংসার। 'রঙমহল' রঙ্গমঞ্চে অভিনয়-সফল নাটক।

প্লাবন

"নাট্যভারতী' মঞ্চে নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরির পরিচালনায় অত্যন্ত জনপ্রিয় নাটক। একটা বিরাট এবং ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে নাটকের চরম মুহূর্ত নিহিত; "প্রজাবন্ধু" শেখরনাথের খুন হওয়ার দৃশ্য থেকে আরম্ভ করে প্লাবনের রাত্রে নীলাম্বরের পরিচয় প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত প্রতিটি দৃশ্য রুদ্ধশ্বাস নাটকীয় উত্তেজনায় সমৃদ্ধ।

শেষলগ্ন

বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের শ্যামলী কন্যার প্রতি সমাজের হৃদয়হীন অহংকারতা নিয়ে হাসি- অশ্রুর বিচিত্র টানাপোড়েন। বহুপঠিত 'উলু' গল্পের গৌরীর অশ্রুসজল ট্র্যাজেডি মননশীল কথাকারের উদ্ভাবন-বৈশিষ্ট্যে সুষ্ঠু মিলনান্ত পরিণতি লাভ করেছে। রঙমহলে শতাধিক রজনী অভিনীত জনসমাদৃত নাটক।

বিলাসকুঞ্জ বোর্ডিং

একটা হীন ষড়যন্ত্র থেকে অমিতাকে উদ্ধার করে নীলাদ্রি তাকে বাড়ি পৌঁছতে যাচ্ছিল। পথে মোটর-দুর্ঘটনায় পড়ে তারা দুজনে উঠল 'বিলাসকুঞ্জ বোর্ডিং-হাউসে'। তারপর বহু বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত মধুর মিলন। মিষ্টি গল্পে মনোজ বসুর যে খ্যাতি প্রায় প্রবাদের মতো, এই লঘুছন্দ নাটকে তার পরিপূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়।

রাখিবন্ধন

লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ-আইনের বিরুদ্ধে রাখিবন্ধনের প্রতিজ্ঞা নিয়ে জেগে উঠেছিল একদা বাংলার যুব-সমাজ। মৃত্যুপণ সেই আন্দোলনের চরম লক্ষ্য স্বাধীনতা—তার রূপ কি সার্থক হয়ে উঠেছে আজকের এই দ্বিখণ্ডিত বাঙলায়? এই ট্র্যাজেডির সুর অপূর্বসূক্ষ্মতায় প্রতিবিম্বিত করেছেন মনোজ বসু 'রাখিবন্ধন' নাটকে।

ডাকবাংলো

'বৃষ্টি, বৃষ্টি' উপন্যাসের নাট্যরূপ। দেবনারায়ণ গুপ্ত নাটকায়িত। স্টার থিয়েটারে বিপুল সমারোহে অভিনীত।